# নাজাতের জন্য শিরকমুক্ত ঈমান ও বিদ‘আতমুক্ত আমল জরুরী

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

*২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে খিলগাঁও বাজার জামে মসজিদে প্রদত্ত জুমু‘আর বয়ান।*

الحمد لله وكفى وسلام علي عباده الذين اصطفى، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة في الأسلام. أوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

আল্লাহ তা‘আলা দোজাহানের কামিয়াবীর জন্য মৌলিকভাবে আমাদেরকে দু’টি জিনিস দান করেছেন। ঈমান আর আমল। বাকি সব এরই ডালপালা ও ব্যাখ্যা। ঈমান অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর আমল বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে জড়িত। এ দু’টির মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ঈমান। **এর একটা কারণ হল,** শুধু ঈমান দ্বারা এমন হাজারো লোক বেহেশতে যাবে, যাদের কোন নেক আমল নেই। অর্থাৎ, তারা নেক আমল করেনি বা করলেও কবুল হয়নি। তবে তাদের ঈমানটা সঠিক ছিল। এই লোকগুলো একসময় জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কোন ঈমানদার স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকতে পারে না। মুমিন আর জাহান্নাম একসাথে হয় না; সাময়িক হতে পারে, স্থায়ী হতে পারে না। মোটকথা, শুধু ঈমানের বদৌলতে হাজারো-লাখো লোক জান্নাতে যাবে।

**আরেকটা কারণ এই** যে, যিনি আমল করছেন, তার অন্তরে যদি বিশুদ্ধ ঈমান না থাকে তাহলে তার কোন আমল আল্লাহর দরবারে নেক আমল হিসেবে গৃহীত হয় না। হ্যাঁ, আপনার আমার নজরে গৃহীত হতে পারে, কিন্তু যার কাছে ফিরে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে, তার কাছে গৃহীত হয় না। মোটকথা, ঈমান ছাড়া কোন নেক আমল নেই।

ফসলের ক্ষেতে লোকেরা বাঁশ-কাঠের একটা কাঠামোকে জামা-কাপড় পরিয়ে রাখে, যেটাকে কাকতাড়ুয়া বলা হয়। উদ্দেশ্য, কোন পাখি, জন্তু-জানোয়ার যেন ক্ষেতে আসতে সাহস না পায়, ফসল নষ্ট না করে। তো ঐ কাকতাড়ুয়াটা শিয়ালের দৃষ্টিতে মানুষ। শিয়াল ওটাকে দেখে মনে করে, বিরাট এক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোন মানুষ ওটাকে মানুষ মনে করে না।

ঠিক তেমনিভাবে অনেক কিছু আপনার আমার দৃষ্টিতে ভালো কাজ, নেক কাজ, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে নেক কাজ নয়। কেননা আমলকারীর মধ্যে ঈমান নেই। এই যে খ্রিস্টানরা বিশ্ব জয় করার জন্য অকাতরে সেবামূলক কাজ করছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে হাসপাতাল বানিয়ে দিচ্ছে। মহল্লায় মহল্লায় স্কুল বানিয়ে দিচ্ছে। বাড়িতে বাড়িতে টয়লেট বানিয়ে দিচ্ছে। টিউবওয়েল গেড়ে দিচ্ছে। বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে। দুনিয়ার যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে, এগুলো ভাল আমল কিনা? সবাই বলবে, হ্যাঁ, ভাল আমল; তারা মানুষের খেদমত করছে, সেবা করছে। সবাই একথাই বলবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর দীন সম্পর্কে ইলম রাখে, কুরআন-সুন্নাহর রৌশনীতে যার অন্তর আলোকিত, সে বলবে, দেখতে তো নেক আমল; কিন্তু বাস্তবে এগুলোর একটাও নেক আমল নয়। কারণ, যারা এগুলো করছে তাদের ঈমান নেই, তারা কাফের। ইয়াহুদীরা কাফের। খ্রিস্টানরা কাফের। হিন্দুরা কাফের। বৌদ্ধরা কাফের। জৈনরা কাফের। শিখরা কাফের। আবার যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় এদের মধ্যেও বহু কাফের আছে। শিয়ারা কাফের। কাদিয়ানীরা কাফের। এদের কারো ঈমান নেই। কাজেই এরা আমাদের দৃষ্টিতে যত ভাল কাজই করুক, আল্লাহর খাতায় এগুলো ভালো কাজ গণ্য হবে না; এর কোন সওয়াব তারা পাবে না।

মোটকথা ঈমান ও আমলের মধ্যে ঈমান এজন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান ছাড়া আমলের অস্তিত্বই হয় না। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং বহু হাদীসে এই শর্তটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমি যে আয়াতটি পড়েছি, এখানেও আমলের জন্য ঈমানকে শর্ত করা হয়েছে।

من عمل صالحا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن...

অর্থ : যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় নেক আমল করবে –সে পুরুষ হোক বা নারী– আমি অতিঅবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট আমল অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই দান করব। (সূরা নাহল-৯৭)

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল, কোন আমল নেক হওয়ার জন্য ঈমান থাকা অপরিহার্য শর্ত।

হ্যাঁ, আমল নেক হওয়ার আরো কিছু শর্ত আছে। যেমন আমলটি নবীজীর তরীকায় হতে হবে। নবীজীর তরীকায় না হলে ঈমানদারগণ করলেও সেটা নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে না। এই যে কয়েক দিন পরেই মীলাদ-কিয়াম, উরস ও জশনে জুলূস শুরু হবে, দেখবেন, সেখানে আশেকে রাসূলদের ভীড় লেগে গেছে। অথচ রাসূলের তরীকার সঙ্গে, তার সুন্নাতে সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। মাজারে যত কিছু হচ্ছে– ফাতেহা হচ্ছে, মান্নত হচ্ছে, সেজদা হচ্ছে, গাড়ি থামিয়ে পয়সা দেয়া হচ্ছে, এর একটাও নেক আমল নয়। কারণ, এখানে সুন্নাত নেই, নবীর তরীকা নেই।

মূর্খ লোকেরা এগুলোকে খুব গুরুত্ব দেয়। রাজধানী ঢাকা থেকেও গাড়ি ভরে ভরে লোকজন ‘লেংটা’র দরবারে যাচ্ছে। তারা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে যে, একটা বয়স্ক লোক উলঙ্গ হয়ে আছে, ফরয তরক করে রেখেছে, ফলে সে চব্বিশ ঘন্টা গুনাহগার হচ্ছে, তার উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হচ্ছে, তবু তাদের বুঝে আসছে না যে, এমন একটা অভিশপ্ত লোক কিভাবে পীর হয়?

সারকথা, কোন মুমিন-মুসলমানও যদি বাহ্যিকভাবে ভালো কাজ করে কিন্তু রাসূলের তরীকায় না করে তাহলে সেটাও নেক আমল হবে না; বিদ‘আত হবে।

আমল নেক হওয়ার জন্য তিন নম্বর শর্ত হল, আমলের মধ্যে ইখলাস থাকতে হবে। অর্থৎ আমলটি একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য হতে হবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে হতে পারবে না।

কিছু লোককে দেখা যায় খুব দীনী কাজ করে। এলাকার সব মসজিদ, মাদরাসায়, এতিমখানায় তার দান-অবদান আছে। নতুন কোন দীনী প্রতিষ্ঠান হলে, কোন দীনী প্রোগ্রাম হলে সে অবশ্যই উপস্থিত থাকে। এতে লোকজন তার ভক্ত হয়ে

যায়। তাকে বিভিন্ন মাহফিলে সভাপতি বানিয়ে দেয়। কারণ, তাকে সভাপতি বানালে প্রতিষ্ঠানে অন্তত লাখখানেক টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুদিন পর সবাই বুঝতে পারে, তার এই দান-খয়রাত ছিল ইলেকশনে জয় লাভ করার কৌশল। জনগণ যেন একচেটিয়া তার পক্ষ নেয় এজন্য সে মসজিদ বানিয়েছে, মাদরাসা বানিয়েছে; তার উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজি-খুশি করা নয়। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে দান বলা হবে না, নেক আমল বলা হবে না। কারণ, এখানে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত পাওয়া যায়নি; বরং রিয়া বা লোক দেখানো পাওয়া গেছে। সুতরাং তার এতসব দান-অবদানও নেক আমল হল না। মোটকথা, আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে এই তিনটি শর্ত পুরা হওয়ার পর।

আমি ছফর মাস সম্পর্কে একটি হাদীস পড়েছি। ছফর মাস সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা আইয়ামে জাহেলিয়্যাত থেকে চলে আসছে। সেগুলোর মূলোৎপাটন করার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণনা করে গেছেন, যাতে জাহেলিয়্যাতের ঐ আক্বীদা-বিশ্বাস মুসলমানদের মধ্যে না থাকে। কারণ, ঐ আক্বীদা-বিশ্বাস যদি আমাদের মধ্যে এখনো বহাল থাকে তাহলে আমাদের ঈমান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। যার আক্বীদা-বিশ্বাসের মধ্যে জাহেলিয়্যাতের মিশ্রণ ঘটেছে, তার ঈমান কখনো কবুল হবে না; চাই সে যতই নামায পড়ুক, যতই রোযা রাখুক, যতই হজ্জ করুক এবং যতই দান-খয়রাত করুক। বিশুদ্ধ ঈমান ছাড়া এগুলো সব মূল্যহীন।

একটু আগেও বলা হয়েছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন কাজ ভালো হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হলো, আমলকারীকে ঈমানওয়ালা হতে হবে। আবার শিরকযুক্ত ঈমানওয়ালা হলেও চলবে না, শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমানওয়ালা হতে হবে। কারণ, শিরকযুক্ত ঈমানওয়ালা যদি কোন ভালো কাজ করে; নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে, দান-খয়রাত করে তাহলে তার নামায, রোযা, হজ্জ, দান-খয়রাত কোনটিই ইবাদত বলে গণ্য হবে না।

যাই হোক, পঠিত হাদীসের বিষয়বস্তু ঈমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলেছেন, لا عدوى এর অর্থ হল, ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে কোন সংক্রামক রোগ নেই। অর্থাৎ, একজন মুমিন-মুসলমানের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, দুনিয়াতে কোন ছোঁয়াচে রোগ নেই। যদিও এটা ডাক্তারদের মতের বিপরীত।

এখন আমরা ডাক্তারদের থিওরি মানব না রাসূলের কথা মানব? ডাক্তাররা তো ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের লেখা বই পড়ে পড়ে ডাক্তার হয়েছে। সুতরাং তারা সেখানে যা পেয়েছে তা-ই বলছে। তাদের বিদ্যার দৌড় ঐসব বই পর্যন্তই। বুখারী শরীফের হাদীসে কী আছে তা তো তারা জানে না। এভাবে তাদের নিজেদের ঈমানও খারাপ হয়ে গেল। আর তাদের মাধ্যমে হাজারো লোকের ঈমান নষ্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ, ডাক্তাররা এই যুক্তি দেয় যে, তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে যে, সর্দি-জ্বর বা এ জাতীয় রোগীর হাঁচি-কাশি থেকে নির্গত জীবাণু অন্যের নাকে-মুখে প্রবেশ করলে তারও হাঁচি-কাশি হয়। তো এ রকম যুক্তি ও অভিজ্ঞতার কথা তো সাহাবায়ে কেরামও নবীজীর কাছে পেশ করেছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথমে একটা উটের পাঁচড়া হয়। অতঃপর ওটার সাথে যে উটটা থাকে, দেখা যায় সেটারও পাঁচড়া হয়। ছোঁয়াচ বা সংক্রমণ না থাকলে এই দ্বিতীয় উটটা কিভাবে পাঁচড়ায় আক্রান্ত হল? নবীজী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, বলো তো, প্রথম উটটা কিভাবে পাঁচড়ায় আক্রান্ত হল? ওর পাশে তো আরেকটা পাঁচড়া-আক্রান্ত উট নেই! সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ওটা আল্লাহর হুকুমে হয়েছে। নবীজী বললেন, ঐ দ্বিতীয়টায়ও আল্লাহর হুকুমে হয়েছে।

এটা তো আমাদেরও দেখা যে, পরিবারের কেউ জলবসন্তে আক্রান্ত হয়েছে। একজন তার খুব সেবাযত্ন করছে। ফোস্কার সব রস-কষ সেবকের হাতে-গায়ে লাগছে। আর আরেকটা লোক এই রোগীর ধারে-কাছেও আসে না, বসন্তে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে দূরে দূরে থাকে। দেখা গেছে, এই দূরে দূরে থাকা লোকটা বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মরেই গেছে। পক্ষান্তরে যার শরীরে বসন্তের রস-কষ পর্যন্ত লাগল, তার কিচ্ছুটি হয়নি। এবার বলুন, কোথায় ছোঁয়াচে রোগ? ডাক্তাররা বললেই হবে? ডাক্তারদের থেকে বড় ডাক্তার কে? আল্লাহ। আর মানুষের মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় ডাক্তার। তাঁর থেকে বড় ডাক্তার নেই। হাদীসের প্রত্যেকটা কিতাবে 'কিতাবুত ত্বিব' আছে, চিকিৎসা অধ্যায় আছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, খাওয়ার আগে উভয় হাত ধোও। ডাক্তাররাও তো একথা বলে। প্রয়োজনে বাম হাতও তো ব্যবহার করতে হয়, এজন্য এটাও ধুতে বলেছেন। এটাও ডাক্তাররা মানে। আরও বলেছেন, পেটকে তিন ভাগ করে খাও; এক ভাগে খানা, এক ভাগে পানি আর এক ভাগ শ্বাস নেয়ার জন্য খালি রাখো। এই তরীকায় কিছুদিন খেয়ে দেখেন, ইনশাআল্লাহ কোন রোগ-বালাই হবে না। এগুলোও ডাক্তারী কথা।

তাছাড়া তিনি বিভিন্ন রোগের জন্য শিঙ্গা লাগাতে বলেছেন। নবীজীর প্রধান চিকিৎসা ছিল শিঙ্গা লাগানো। এটা নিয়ে মুসলমান ডাক্তাররা মাথা ঘামায় না। তারা খ্রিস্টান ডাক্তারদের চিকিৎসা নিয়েই পড়ে আছে। (অবশ্য এখন ঢাকা শহরেও কিছু কিছু জায়গায় হিজামা/শিঙ্গা [কাপিং] পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলছে।) নবীজী কালোজিরা সম্পর্কে বহু কথা বলে গেছেন। এটা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মোটকথা, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডাক্তার নবীজী এ কথা বলে গেছেন যে, কোন ছোঁয়াচে রোগ নেই। এর উল্টো বিশ্বাস করলে আমাদের ঈমানের উপর আঘাত আসবে। এটা এই হাদীসের প্রথম কথা।

দুই নম্বর কথা হল : ولا طيرة ইসলামে কোন অশুভ লক্ষণ নেই। উদাহরণত আপনি সফরে রওনা হয়েছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ামাত্র একটা কানা লোকের সঙ্গে দেখা হল। আপনি মনে করলেন, আমার সফরটাই নষ্ট হয়ে গেল; উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। কেন? কারণ, কানা লোকের সাথে দেখা হয়েছে। আরে! কানা লোক তার কাজে যাচ্ছে, আপনিও আপনার কাজে চলে যান। কানার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? অনুরূপভাবে ঘরের উপরে একটা পেঁচা এসে বসল। ব্যস, ঘাবড়ে গেলেন যে, বাড়িতে মনে হয় কেউ মারা যাবে। আচ্ছা, ঘরের চালে পেঁচা বসার সঙ্গে মানুষ মারা যাওয়ার কী সম্পর্ক?

এগুলো সব জাহেলিয়্যাত। এগুলো হিন্দুদের মধ্যে আছে। কিন্তু ইলম না থাকার দরুন ঐ হিন্দুয়ানী জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে চলে এসেছে। আমরা এগুলো বিশ্বাস করব না। এগুলো ঈমানবিরোধী বিশ্বাস। ইসলামে কোন অশুভ লক্ষণ নেই। যা কিছু হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। ভালো হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে, মন্দ হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে।

মুমিনের কোন কিছু মন্দ নেই। তাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত খারাপ হালতেই দেখা যাক, অন্য দৃষ্টিতে এই হালত তার জন্য নেয়ামত ও রহমত। কাউকে দেখা গেল, আগুনে পুড়ে মরে গেছে। কিন্তু আল্লাহর দরবারে সে শহীদ হয়ে গেছে। অথবা কারো ছেলে মারা গেছে, আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে। তো যাক, হতে পারে ঐ ছেলে তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

মোটকথা, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত খারাপই দেখা যাক, একটা লোক ঈমান আনার পরে তার কোন খারাবি নেই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা সকল খারাবিও তার জন্য মঙ্গলজনক।

ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে একটি শিরোনাম লিখেছেন যে, 'কোন মুমিনের জন্য কি এ কথা বলা জায়েয আছে যে, 'আমি একজন দুর্ভাগা লোক, হায় আমার দুর্ভাগ্য।' এই শিরোনামের অধীনে ইমাম বুখারী রহ. হাদীস বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, একজন মুমিনের জন্য এ কথা বলা জায়েয নেই। কারণ, সে যখন ঈমান এনেছে, ঈমান আনার সাথে সাথেই সে দুর্ভাগাদের কাতার থেকে বের হয়ে গেছে। এখন সে ভাগ্যবান এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা, ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস হল, ইসলামে কোন অশুভ নেই। অমুক দিন, অমুক মাস শুভ আর অমুক দিন, অমুক মাস অশুভ কিংবা অমুক দিন যাত্রা নাস্তি, অমুক দিন যাত্রা শুভ–ইসলামে এসব নেই।

হ্যাঁ, শুভ লক্ষণ আছে। কথার কথা, আপনি বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। পথে একজন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে দেখা হল। আপনি মনে করলেন, বের হয়ে যখন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে কথা হল, তো আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে হয়তো কামিয়াব করবেন। এমন সুধারণা নিষেধ নয়। কারণ, কোন কিছুকে শুভ মনে করলে আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা করা হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সন্ধিবিষয়ক কথাবার্তা বলার জন্য মক্কা থেকে পরপর কয়েকজন নেতা এসেছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও সন্ধি হয়নি; কথা বনেনি। এরপর চতুর্থ নম্বরে যে নেতাটি আসল, তার নাম ছিল সুহাইল। সুহাইল মানে সহজ। তো এই নেতাকে দূর থেকে দেখেই আল্লাহর রাসূল মন্তব্য করেছেন, সুহাইল যখন আসছে, আশা করা যায় ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তার আগমন থেকে নবীজী একটা শুভলক্ষণ নিলেন যে, এর নামই যখন 'সহজ', আশা করা যায়, ব্যাপারটাও সহজ হবে। ঘটলও তা-ই। সে আসার পর তার সঙ্গে কথার মিল হল। ব্যস, চুক্তিনামাও স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। তাহলে দেখা গেল, নেকফালি বা শুভলক্ষণ নেয়া নিষেধ নয়। কারণ, এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা করা হয়। পক্ষান্তরে কোন জিনিস থেকে কুলক্ষণ নেয়া যাবে না। তাহলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় শব্দ হল, ولا صفر অর্থাৎ ইসলামে 'ছফর' নেই। এই ছফর মানে ছফর মাস। এটা সীন হরফ দিয়ে না, ছদ হরফ দিয়ে।

যাই হোক, ইসলামে ছফর নেই একথার মানে কী? জাহেলিয়্যাতের যামানায় ছফর মাসকে অশুভ মনে করা হত। সে সময় লোকের ধারণা ছিল, এ মাসে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব-গযব নাযিল হয় এবং এ মাসে কোন খায়র ও বরকত হয় না। এজন্য এ মাসে তারা বাড়ি-ঘর নির্মাণ শুরু করত না, বিবাহ-শাদী করত না, ব্যবসা শুরু করত না। অনুরূপ অনেক কাজ থেকে তারা এ মাসে বিরত থাকত।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটিমাত্র শব্দ দিয়ে জাহেলিয়্যাতের সমস্ত গলদ প্রথা রহিত করে দিলেন যে, ইসলামে ছফর মাস নেই, ছফর মাসে কোন খারাবি নেই। অর্থাৎ, তারা যে ছফর মাসকে খারাপ মনে করছে, এটা ভিত্তিহীন। ছফর মাস আল্লাহর কাছে অশুভ নয়। অন্যান্য মাসের মত ছফরও একটি মাস মাত্র, এতে অশুভ কিছু নেই।

তো ঐ জাহেলিয়্যাতের আক্বীদা-বিশ্বাস আজও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। অনেকে এ মাসে, অনেকে আবার মুহাররম মাসে বিবাহ-শাদী করতে রাজি হয় না। বলে, এ মাসে কৃত বিবাহ টিকবে না। কেউ আবার ব্যবসা শুরু করতে চায় না। বলে, এ মাসে শুরু করা ব্যবসায় লাভ হবে না। এটা জাহেলিয়্যাত। এই বিশ্বাস ঈমানের মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি সৃষ্টি করে।

ইসলামের দুশমনরা তো ছফর মাসের বিরুদ্ধে জাল হাদীস পর্যন্ত তৈরী করেছে। من أخبرني بخروج صفر بشرته بالجنة এটা জাল হাদীস। নবীজী নাকি বলেছেন, যে কেউ আমাকে ছফর মাস চলে যাওয়ার সংবাদ দিবে, আমি তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিব। (নাউযুবিল্লাহ) সমস্ত বড় বড় আলেম– মোল্লা আলী ক্বারী রহ., আল্লামা আজলূনী রহ.-সহ হাদীসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বড় বড় ইমামগণ এই হাদীসকে ভিত্তিহীন, জাল ও বানোয়াট বলেছেন।

মোটকথা, ছফর মাসে এ জাতীয় কোন খারাবী নেই। সুতরাং এ মাসে সমস্ত ভালো কাজ করা যাবে। যারা খারাবী আছে মনে করবে, তাদের ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে।

এ মাসে আরেকটা খারাপ প্রথা আছে– আখেরী চাহার শোম্বা–এটাও ঈমান বিধ্বংসী। আখেরী চাহার শোম্বা মানে ছফর মাসের শেষ বুধবার। কোন কোন দেশে এই তারিখে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। আমাদের বাংলাদেশেও এই তারিখে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

এটা ইসলামে নিষেধ। আখেরী চাহার শোম্বার কাহিনী হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে ছফর মাসের শেষ বুধবারে অসুস্থ হলেন। অসুস্থতার খবর পেয়ে ইয়াহুদীরা খুব খুশি হল। তারা ধারণা করল, এইবার বোধহয় বিপদটা কেটে যাবে (নাঊযুবিল্লাহ)। তারা রাসূলুল্লাহকে বিপদ মনে করত।

পরবর্তীকালে ইয়াহুদীদের ঐ আনন্দ প্রকাশের বিষয়টা কিছু ভণ্ড লোকের দ্বারা ইসলামের মধ্যে চলে আসল। তখন এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হল যে, এ তারিখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। সুস্থ হওয়ার পরে তিনি গোসল করেছিলেন। এজন্য এই তারিখে খুশি পালন করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামে এনে এটাকে উল্টোভাবে প্রচার করা হল।

ফলাফল কী হল? যেটা ছিল মুসলমানদের দুঃখের দিন, সেটাকে বানিয়ে দেয়া হল ফুর্তির দিন। এই দিন মুসলমানরা আলোকসজ্জা শুরু করল। মিষ্টি বিতরণ শুরু করল। আরো কতো কি! এমনকি এ দিনের আমল হিসেবে একটা বানোয়াটি নামাযও শুরু করল যে, এই দিন চাশতের সময় কেউ যদি নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে চার রাক'আত নামায পড়ে, তার জন্য এই এই সুসংবাদ আছে! নাউযুবিল্লাহ। বলুন তো, কোন আমলের ফযীলত বয়ান করতে হলে সেটা হাদীসে থাকতে হয় না? অবশ্যই থাকতে হয়। কিন্তু উক্ত নামায ও তার ফযীলত কোনটিই হাদীসে নেই। যা আছে সব জাল ও বানোয়াট বর্ণনা।

**(৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

# মুহাম্মদপুরের ওয়াযাহাতি জোড়ের বয়ান

*২৯ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তাবলীগ জামা'আতের চলমান সঙ্কটে উম্মতের করণীয় সম্পর্কে মুহাম্মদপুরের সলিমুল্লাহ রোডস্থ কবরস্থান ময়দানে এক ওয়াযাহাতি জোড় (স্পষ্টকরণ সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র কয়েকদিনের মেহনতে বাংলাদেশের ৬৪ জেলা থেকে দলমত নির্বিশেষে প্রায় আড়াই লক্ষাধিক উলামায়ে কেরাম ও তাবলীগী মুসল্লী জোড়ে অংশগ্রহণ করেন। সকাল আটটায় শুরু হয়ে যোহর পর্যন্ত জোড় চলতে থাকে। রাত এগারো-বারোটার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসল্লীগণ তাশরীফ আনতে থাকেন। পুরো বাংলাদেশকে বিভাগওয়ারী আটভাগে ভাগ করে মুহাম্মদপুরের মসজিদ-মাদরাসাগুলো আগত মুসল্লীদের ভরপুর ইস্তিকবাল করে। ফজরের পরপরই মূল ময়দান কানায় কানায় ভরে যায়। সম্মেলন শুরু হতেই আশপাশের রাস্তাঘাটে মুসল্লীগণ বসে পড়েন। অবস্থাদৃষ্টে বহুদূর পর্যন্ত মাইকের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও তাবলীগ জামা'আতের মুরব্বীগণ পর্যায়ক্রমে তাদের বয়ান ও পরামর্শ পেশ করেন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেও মুসল্লীগণ প্রবল আগ্রহ ও জোশের সাথে কাদাপানিতে বসেই বয়ান শুনতে থাকেন। মুহাম্মদপুরবাসী তাদের স্মরণকালে এত বড় ও এত শান্ত জনসমাবেশ প্রত্যক্ষ করেনি। জোড় শেষে উলামায়ে কেরাম ও আগত মুসল্লীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ছয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গুরুত্ব বিবেচনা করে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বিশটি বয়ান পাঠকের খেদমতে পেশ করা হল।*

---

**আল্লামা আহমদ শফী সাহেব দা.বা.**

হামদ ও সালাতের পর...

উলামা হযরতগণ নবীগণের ওয়ারিস। আজকে হাজার হাজার মাদরাসা-মসজিদকে কেন্দ্র করে উলামা হযরতগণ আল্লাহ-আল্লাহ জপছেন, আর দরসের (ক্লাসের) সময় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দীন শেখাচ্ছেন– এটাই তাদের কাজ। এই যে আমরা কথায় কথায় দেওবন্দ দেওবন্দ বলে থাকি; দেওবন্দ মাদরাসা তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো নকশা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদেরকে পড়ালেখার শেষদিকে আমরা বলে থাকি, যাও! কিছুদিন দেওবন্দ সফর করে আসো; যেন তোমার যিন্দেগী দেওবন্দের ফাতাওয়া মোতাবেক হয়ে যায় এবং তুমি বড় আলেম হতে পারো।

তাবলীগের ব্যাপারে আমরা সেই দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতাওয়া পেয়ে গেছি এবং সে অনুযায়ী আমাদের আলেমগণ, মুফতীগণ বয়ান করে যাচ্ছেন। তাবলীগের তিন মুরুব্বী হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ. যে উসূলের উপর মেহনত করে গেছেন তাবলীগ সে উসূলের উপর চলবে। আপনারা সকলে এর উপর রাজি আছেন? আমরা আলেম উলামারা ওয়াজ-মাহফিলে, বয়ান-ভাষণে সকলে একথা বলে দিবো যে, তাবলীগের ব্যাপারে এই তিন মুরুব্বী ব্যতীত অন্য কারো কথা আমরা মানবো না। আমরা নিজেরাও এর উপর আমল করবো, অন্যদেরকেও তাদের বাতানো উসূলের উপর নিয়ে আসবো। আমরা সকলে সব জায়গায় হক্কানী উলামায়ে কেরামের নির্দেশনা অনুযায়ী চলবো। বাংলাদেশের আলেম উলামা একেকজন সিংহের ন্যায়। সব সময় আমরা এসব উলামায়ে কেরামকে মানবো। যিনি যোগ্য আলেম নন এমন কোন ব্যক্তি যদি কোন মাযহাব-মতাদর্শ তৈরি করে সেটা কখনোই মানা যাবে না। তাবলীগের কাজ উলামা হযরত থেকে এসেছে এবং এখনো তাবলীগের কাজে দিকনির্দেশনা দিবেন আলেমগণ। তাবলীগ সম্পর্কে জানেন আলেম উলামা ও মুফতিয়ানে কেরাম। তারা আমাদেরকে কিছু বললে, কখনো রাগান্বিত হলে সেটা আমরা সহ্য করতে পারবো। কিন্তু যারা তাবলীগের হাকীকত সম্পর্কে কিছুই জানে না, আলেমদেরকে পছন্দ করে না, আলেম-উলামা ও ছাত্রদের সাথে ঝগড়া করতে আসে, তাদেরকে মারতে আসে, তারা কিছুতেই এখানে নাক গলাতে পারবে না। আমরা তাদেরকে সহ্য করতে পারবো না।

আমি একটি হাদীস পড়েছি-

الدين النصيحة

অর্থ : দীন পুরোপুরি নসীহতের নাম।

নসীহত কাকে বলে? একে অপরের মঙ্গল কামনা করার নাম হলো নসীহত।

এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দীন পুরোপুরি নসীহতের নাম, মঙ্গল কামনার নাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কার মঙ্গল কামনা করবো? আল্লাহর রাসূল বললেন, لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم প্রথমে আল্লাহর সাথে ভালাই (মঙ্গল কামনা) করতে হবে। আল্লাহর সাথে ভালাই করার অর্থ হলো, আল্লাহর কুরআন মোতাবেক জীবন চালানো। আর কুরআন বুঝেন আলেম-উলামাগণ। সুতরাং আলেম-উলামার সাথে মন্দ আচরণ করে কখনো আল্লাহর সাথে খায়েরখাহী বা কল্যাণ কামনা সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে আমাদেরকে খুব সাবধান থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়েরখাহী করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় লক্ষাধিক পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলের সাথে ভালাই করার অর্থ হলো, রাসূলের সুন্নাত তরীকা মোতাবেক আমল করা।

আজকে যারা রাসূলের তরীকা বাদ দিয়ে নতুন নতুন মতাদর্শ আবিষ্কার করছে এদের কাউকে মানা যাবে না। এখন সালাফী, খালাফী, গাইরে মুকাল্লিদ নামে কতো ধরনের ফিরকা বেরিয়েছে। তাবলীগের মধ্যেও একটা নতুন ফিরকা, নতুন তাবলীগ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ফিরকা হুবহু জামায়াতে ইসলামীর মতো; কোন বেশকম নেই। জামায়াতে ইসলামীও এক ধরনের নতুন ইসলাম কায়েম করতে চেয়েছিল।

মোটকথা, নবীওয়ালা ইসলামের সাথে ভালাই কামনা করা। ইসলামে নবীওয়ালা ছোট-বড় যতো সুন্নাত তরীকা আছে সবগুলোকে মানা। কুরআন থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি– আমরা সবাই মুসলমান। মুসলমানের আলামত হলো, যথাসময়ে নামায আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিরাশি জায়গায় নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। আপনারা আমার সাথে ওয়াদা করুন, যার যার অবস্থানে থেকে যথাসময়ে নামায পড়ে নিবেন। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সকলকে নামায পড়তে বলবেন। তাদেরকে নামাযের কথা ভালোভাবে বুঝাবেন। আমার কথাটা সকলে রাখবেন তো?

এবার হাদীস থেকে একটা উদাহরণ নিন– ভাইয়েরা! পুরুষের চেহারায় দাড়ি থাকে। কেউ যদি এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখে তাহলে তার নবীর সুন্নাত আদায় হবে না। নবীর সুন্নাত আদায়ের জন্য এবং নবী আলাইহিস সালামের সুপারিশ পাওয়ার জন্য কমপক্ষে এক মুষ্টি দাড়ি রাখতে হবে। যদি কেউ এভাবে দাড়ি না রাখে, কিয়ামতের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশের জন্য উপস্থিত হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলবেন, যাও মিয়া! তুমি কোন ইয়াহুদ-নাসারার উম্মত, আমি তোমাকে চিনি না;

তুমি আমার মুখের সাথে দুশমনি করেছো। তুমি যদি আমার উম্মত হতে তাহলে আমার মতো, লক্ষাধিক পয়গম্বরের মুখের মতো তোমার মুখেও দাড়ি থাকতো! এজন্য ভাইয়েরা! সবাই দাড়ি রাখবেন। রাখবেন তো?

মুফতিয়ানে কেরাম, উলামায়ে কেরাম যেভাবে বলবেন এই তাবলীগ সেভাবেই ধরে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। যারা জানে না, তাদের কাউকে এ বিষয়ে কিছু করতে দিবেন না। আপনারা সকলে কমপক্ষে এক-এক সপ্তাহ সময় নিয়ে তাবলীগের জন্য গ্রামে-গঞ্জে বেরিয়ে পড়বেন। প্রয়োজনে মাদরাসা ছুটি দিয়ে হলেও তাবলীগে বেরিয়ে পড়বেন। সতর্ক থাকবেন, এদেশে যেন নতুন ধারার তাবলীগ আসতে না পারে। আমি এনজিওদের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করতে পনের দিনের জন্য মাদরাসা ছুটি দিয়ে উস্তাদ-ছাত্রদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে ছিলাম।

আপনারা মাদরাসাগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। সাহায্য সহযোগিতা করবেন। ছাত্র-উস্তাদগণের সহযোগিতা করবেন। নিজ নিজ এলাকার মাদরাসাগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখবেন।

তৃতীয় বিষয় হলো, أئمة المسلمين মুসলমানদের ইমামের ভালাই কামনা করা। মুসলমানদের ইমামকে তো আর এখন পাওয়া যাবে না। তবে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান হতে শুরু করে এমপি, মন্ত্রী সকলকে– নিজে গিয়ে হোক বা চিঠির মাধ্যমে হোক– নসীহত করতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে, আপনারা শরীয়তমতে রাষ্ট্র পরিচালনা করুন, জোর জুলুমের রাজনীতি করবেন না।

চতুর্থ বিষয় হলো, لعامتهم অর্থাৎ, মুসলিম জনসাধারণের ভালাই কামনা করা। এই যে আপনারা হাজার হাজার মানুষ এখানে এসেছেন, আপনাদেরকে আমরা নসীহত করছি, ইসলামের কথা বলছি এটাই হলো আপনাদের প্রতি নসীহত বা ভালাই কামনা। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন।

### আল্লামা মাহমূদুল হাসান দা.বা.-এর চিঠি

(মুহতামিম, যাত্রাবাড়ি মাদরাসা ও আমীরুল উমারা, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ)

ছদরে মুহতারাম আল্লামা আহমদ শফী দা.বা. ও শীর্ষস্থানীয় উলামা মাশায়েখ ও বেরাদারানে ইসলাম!

দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান সংকটের ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম দারুল উলূম দেওবন্দের ভূমিকাকে সমর্থন করে এসেছি। বাংলাদেশে স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তা অনুসরণ করার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। বাংলাদেশে তাবলীগী জামা'আতের সংকট নিরসনে যারা কাকরাইল শুরার উপদেষ্টা কমিটি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন, আজকের এই সম্মেলন– ওয়াযাহাতি জোড়ে আমি শীর্ষ উলামা মাশায়েখ ও মুরুব্বিয়ানে কেরামের সাথে একমত পোষণ করে এই আহ্বান জানাতে চাই– আসুন বড়দের কথা মেনে নিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের এ মুবারক কাজকে তার সঠিক নাহজের উপর চালু রাখি।

### হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ সাহেব দা.বা.

আমি দু'টি কথা বলবো।

এক. আমাদের আজকের এ ইজতেমার উদ্দেশ্য আশা করি সকলের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এরপরও যদি কারও বুঝে না আসে, তাকে বুঝানো সম্ভবপর নয়।

দুই. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের আজকের এই সমস্যার পিছনের কারণ হল, এই কাজ থেকে উলামায়ে কেরামকে দূরে রাখা। যদি উলামায়ে কেরামের সাথে আন্তরিক হয়ে দাওয়াতের এই মেহনত চলতে থাকতো তাহলে আজকের এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। তাই আমি কওমী মাদরাসার সকল শিক্ষক ও দায়িত্বশীলগণকে প্রস্তাব করবো, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বা অন্যান্য বোর্ডের তত্ত্বাবধানে আমরা যদি বৎসরে একটি সময় আমাদের বড় বড় ছাত্রদেরকে নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে কালেমা, নামায, পাক-পবিত্রতা ও দীন শেখাই তাহলে আর আমাদের ওপর এই অপবাদ আসবে না যে, আমরা দীন শেখাই না, দীনের মেহনত করি না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বুঝবার এবং আমল করবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

### মুফতী ওয়াক্কাস সাহেব দা.বা.

সম্মানিত হাযেরীন! তাবলীগ জামা'আতের এই সঙ্কটকালে আমরা দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে আছি। অন্য কোন মতের সাথে নেই। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-ও দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। সে হিসেবে তাবলীগওয়ালারাও দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। তাসাউফওয়ালারা ও দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। সিয়াসাতওয়ালারাও দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। তা'লীমওয়ালারাও দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। এই চারও লাইনে আমাদের আকাবিরগণ কাজ করে গেছেন এবং এখনো করছেন। আমরা দারুল উলূম দেওবন্দের উসূল অনুযায়ী চলছি। কাজেই এ ব্যাপারে অন্য কারও কথা শোনার আমাদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হকের বার্তা বুঝার তাওফীক দান করুক। আমীন।

### মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা.

(প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া)

মু'আযযায ও মুহতারাম আকাবিরে উম্মত ও সকল স্তরের মুসলমান ভাইয়েরা! এ বিষয়ে কোন জলসা ডাকতে হবে, ইজতিমার আয়োজন করতে হবে, এটা কোনদিনও উলামায়ে কেরামের মাথায় ছিল না। কারণ তাবলীগের ব্যাপারে সবাই একমত যে, এটা নেহায়েত মুখলিস জামা'আত, আল্লাহওয়ালা জামা'আত। অনুরূপভাবে তাবলীগ জামা'আতে কোন কিছু নিয়ে দ্বন্দ্ব হবে এবং দারুল উলূম দেওবন্দকে সে ব্যাপারে তাদের মাওকিফ (অবস্থান) জাহের করতে হবে, এটাও কারও কল্পনায় ছিল না। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দারুল উলূম দেওবন্দ তো এ কথা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে যে, যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে আমাদের আশঙ্কা, মাওলানা সাদ সাহেব এমন একটা দল তৈরি করবেন, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারেজ হয়ে যাবে এবং আকাবিরে উম্মত ও আসলাফে উম্মতের তরযও তরীকা থেকে বের হয়ে যাবে। ভাবা যায়, দারুল উলূমের দায়িত্বশীলগণ কতটা বাধ্য হয়ে এবং কতটা দরদ ও ব্যথা নিয়ে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন!

অনেক ভাই বলে থাকেন, দেওবন্দ শুধু তাদের মাওকিফ জাহের করছে; কোন ফতওয়া তো দেয়নি! বলুন তো, এটা কি ফতওয়া না যে, 'মাওলানা সাদ সাহেব যে পথে চলছেন, এভাবে চলতে থাকলে গোমরাহ একটা দল তৈরি হবে!' দারুল উলূমওয়ালারা স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, তার (মাওলানা সাদ সাহেবের) প্রতি আমাদের আস্থা নেই। অর্থাৎ, দেওবন্দের মুরুব্বীগণ মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে বিলকুল বে-ইতমিনান (আস্থাহীন) যে, এ লোকটা কোন দিকে যাবে এবং উম্মতকে কোথায় নিয়ে যাবে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বলুন, এগুলো কি ফতওয়া না? অবশ্যই ফতওয়া।

কিছু ভাই বলাবলি করছে, আলেমরা (মাওলানা সাদ সাহেবের দোষচর্চা করে) গীবত করছে। তাদের একথা সঠিক নয়। আলেমরা কারো গীবত করছে না। আলেমরা যেটা করছেন, সেটা নিছক দীনী কাজ। আলেমরা মুসলমানদের দীন ও ঈমানের হেফাজতের স্বার্থে বাধ্য হয়ে জনগণকে অবহিত করছে। এটা তো সরাসরি দীনী কাজ। কেননা, নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীন দুনিয়াতে রেখে গিয়েছেন, উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব সেটাকে হুবহু কেয়ামত পর্যন্ত এমনভাবে হেফাযত করা যে, তার মধ্যে একটা জিনিসও বাড়তে পারবে না এবং একটা জিনিসও কমতে পারবে না। উলামায়ে কেরাম কেবল সে দায়িত্বটিই পালন করছেন। তাহলে এটা গীবত হলো কি করে?

মাওলানা সাদ সাহেব দীনী বিষয়ে যে সব ভুল করেছেন সেগুলোর একেকটা উচ্চারণ করতেও শরীর শিউরে ওঠে। তিনি বলছেন, হেদায়াত আল্লাহর হাতে না। নাউযুবিল্লাহ। অথচ কুরআনের অন্তত ঊনাশিটি আয়াতে বলা হয়েছে, হেদায়াত আল্লাহর হাতে। তাহলে তিনি তার একটি কথায় ঊনাশিটি আয়াতের বিরোধিতা করলেন কিনা? এবং এতে তার ঈমান খতরার (ঝুঁকির) মধ্যে পড়ে গেল কিনা?

মাওলানা সাদ সাহেব হযরত উমর রাযি.-এর নামে প্রচারিত একটা জাল ও বানোয়াট বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হক্কানী উলামায়ে কেরামের উপর অপবাদ দিচ্ছেন যে, এরা মাদরাসা-মসজিদে পড়িয়ে বেতন খায়, এজন্য পতিতারাও এদের আগে বেহেশতে যাবে। বলুন, জাল ও বানোয়াট বর্ণনাকে কেন্দ্র করে ভুল মাসআলা চালিয়ে দেয়া কি দীনের প্রতি খেয়ানত ও অপব্যাখ্যা নয়? এর দ্বারা কি জনসাধারণের অন্তরে উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় না? সাদ সাহেবের একথায় কি সাধারণ মানুষ তাদের মসজিদের ইমাম, মাদরাসার উস্তাদদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবে না? তারা কি ভাবতে শুরু করবে না যে, আমাদের ইমাম, আমাদের হুযূর তো মসজিদ-মাদরাসা থেকে বেতন নেয়। তাহলে এরা তো আল্লাহর কাছে সম্মানিত না। এভাবে কি সাধারণ মানুষ আলেম-বিদ্বেষী হবে না?

মোটকথা, এভাবে তিনি জনসাধারণের মধ্যে উলামা-বিদ্বেষের ধারা চালু করে দিচ্ছেন। এজন্য অপারগ হয়ে আজ মাদরাসা বন্ধ দিয়ে আমরা এ ইজতিমায় আসতে বাধ্য হয়েছি। উম্মতের ঈমান রক্ষা করার জন্য এবং দীনের সঠিক অবকাঠামো ধরে রাখার জন্য উলামায়ে কেরাম আসতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে আমাদের দুনিয়াবী কোন মাকসাদ নেই।

এই যে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম আপনাদেরকে সমস্যাগুলো খুলে খুলে বোঝাচ্ছেন, এটা গীবত নয়। গীবত কাকে বলে ইমাম গাযালীর কিতাব পড়ে দেখুন। ইমাম গাযালী রহ.-এর কিতাবে আছে, কারো দ্বারা যদি দীনের কোন ক্ষতি হয়, আর সে সম্পর্কে কোন আলেম কথা বলেন, সতর্ক করেন তাহলে এটা গীবত হবে না। বরং এটা বলা তার জন্য ওয়াজিব। মোটকথা, কেউ যদি দীনের অপব্যাখ্যা করে, আর কোন আলেম সেটা ধরিয়ে দেয়, তাহলে এটা গীবত নয়। এটা তো বিলকুল দীনের হেফাজত, মুসলমানদের ঈমানের হেফাজত। উল্টো তারা যে উলামায়ে কেরামের বদনাম করে বেড়াচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে, এটা গীবত।

ভালো করে বুঝুন, আমাদের উদ্দেশ্য কাউকে হটিয়ে দেয়া নয়, কাউকে সরিয়ে দেয়া নয়। আমাদের উদ্দেশ্য, কিছু ভাই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে, এই ভাইদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে হক্কানী আলেমদের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে দীনের কাজকে আরো জোরদার করা।

এতদিন আমরা কোন ব্যক্তির জন্য তাবলীগ করিনি, এখন আমরা কোন ব্যক্তির জন্য তাবলীগ ছাড়বও না। আমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য তাবলীগ করে এসেছি, আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যু পর্যন্ত করে যাব ইনশাল্লাহ। আর সাদ সাহেব যা করছেন, এর বিচার আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। আমরা আমাদের তাবলীগী কাজ করে যাব। ঠিক আছে তো? সবাই উলামায়ে কেরামের সঙ্গে জুড়ে থাকতে রাজি আছি তো?

ইসলামের ইতিহাসে যখনই কোন ফিতনা দেখা দিয়েছে, দেখা গেছে এর মধ্যে কোন সাবায়ী চক্র জড়িত আছে। জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফ্ফীনসহ ইতিহাসের সকল ফিতনার মূল খুঁজে দেখা গেছে, সেখানে ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে, কাফেরদের পক্ষ থেকে একটা দল অনুপ্রবেশ করেছে। বর্তমানেও এই সাবায়ী চক্র মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। উলামা এবং জনগণের মাঝে এই যে বিভেদ, এটাও ওই দলটারই কারসাজি।

বর্তমানের এই ফেতনায় যে, ইয়াহুদীচক্র জড়িত, সাবায়ীচক্র জড়িত এর একটা আলামত পেশ করছি–

গত (১৪৩৯ হিজরী) রমাযানের আগে কওমী মাদরাসাগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর হাজার হাজার তালিবে ইলম চিল্লায় বের হওয়ার জন্য কাকরাইলে সমবেত হয়েছে। এ সময় এই সাবায়ীরা, অথবা তাদের মদদপুষ্ট লোকেরা পুরান ঢাকার জিন্দাবাহার মসজিদ থেকে রওনা হয়ে কয়েকশ' মোটর সাইকেল নিয়ে কাকরাইল মসজিদে হামলা করে বসলো। এরা চিল্লায় যানেওয়ালা তালিবে ইলমদেরকে মারধোর করে জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেললো। সে এক নির্মম দৃশ্য। তারপর যখন সাংবাদিকরা তাদের কাছে ঘটনা জানতে চাইল, তারা সাংবাদিকদেরকে ব্রিফ করল– এই ছাত্ররা কাকরাইল দখল করতে এসেছিল, ফেতনা করতে এসেছিল, তাই আমরা কাকরাইল খালি করতে এসেছি। এমনকি তারা আমার নামও বলল যে, আমি নাকি এই ছাত্রদেরকে সেখানে পাঠিয়েছি। (লা-হাওলা ওয়ালা কুতওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) তো সাংবাদিকদের সামনে এরকম শতভাগ মিথ্যা বিবৃতি দেয়া কি কোন তাবলীগওয়ালার কাজ? অনুরূপভাবে কারও নামে মিথ্যা অভিযোগ করা যে, অমুকে কাকরাইল দখল করতে ছাত্র পাঠিয়েছে– এটাও কোন তাবলীগ-ওয়ালার পক্ষে সম্ভব? এগুলো সরাসরি সাবায়ীদের কাজ, নয়তো তাদের দোসরদের কাজ। সবচেয়ে বড় কথা, ঠিক যে মুহূর্তে হাজার হাজার ছাত্র আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য জড়ো হয়েছে, একেবারে ঠিক সে মুহূর্তটিকেই তারা হামলার জন্য বেছে নিলো! স্পষ্ট বিষয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাজ নষ্ট করা, ফাসাদ সৃষ্টি করা; যেন আলেমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হতে না পারে। এবার বলুন, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা দেয়, তারা কি তাবলীগওয়ালা, না ইয়াহুদীচক্র। আল্লাহ আমাদেরকে হক বুঝবার তাওফীক দান করুন।

এই যে হাজার হাজার আলেম-উলামা, এঁদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন দীনী ব্যস্ততা আছে। তবুও এঁরা সেগুলো স্থগিত করে এখানে এসেছেন আমাদেরকে এই একটা কথাই বোঝানোর জন্য যে, আমাদেরকে হকের সঙ্গে থাকতে হবে। থাকবো তো ইনশাআল্লাহ?

মনে রাখতে হবে, ইসলামে ব্যক্তিপূজা জায়েয নেই। ব্যক্তি যে কোন সময় গোমরাহ হয়ে যেতে পারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. আমদেরকে বহু আগেই সতর্ক করে গেছেন যে,

فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة

অর্থ : জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়।

অনুরূপভাবে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا

অর্থ : মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, আর বিকেলে কাফের হয়ে যাবে।

মোটকথা, আল্লাহ হেফাজত না করলে ব্যক্তির উপর নির্ভর করা যায় না। পক্ষান্তরে দীন সব কিছুর উর্ধ্বে। দীনের জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কত কুরবানী করেছেন। কত আম্বিয়ায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন। দীনের ব্যাপারে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, احفظ الله يحفظك তুমি আল্লাহর দ্বীনের হেফাজত করো, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে, কবরে হাশরে তোমার হেফাজত করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে

হেদায়াতের পথে অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব দা.বা.**
(মুহতামিম, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট)
হামদ ও সালাতের পর...
মহান রব্বুল আলামীনের লাখো-কোটি শুকরিয়া, যিনি বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামকে চলমান ফেতনার মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। আমরা আশা করি, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত উলামায়ে কেরাম ও মুসল্লীবৃন্দের এই ঐক্যের মাধ্যমে ইসলামের নামে, দীনের মেহনতের নামে উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে বাতিল ফিরকাটি সর্বসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে তা ধূলিস্মাৎ করে দিবেন। উলামা-বিদ্বেষী এই বাতিল ফিরকা আসলে দীনের কোন খিদমত করছে না, বরং তারা ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তে পড়ে উলামা-বিদ্বেষী হয়ে, আলেমদেরকে গালিগালাজ করে জাতিকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আমরা উলামায়ে কেরাম ও সর্বসাধারণ সকলেই যদি চৌকান্না থাকি, সতর্ক হই তাহলে এ ষড়যন্ত্র মহান রব্বুল আলামীন শীঘ্রই নস্যাৎ করে দিবেন।
শেষকথা হল, দাওয়াত ও তাবলীগের এই মুবারক মেহনত শুরু থেকেই হক্কানী উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে চলে আসছে এবং উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে থাকলেই তা সহীহ উসূলের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। আমীন।

**মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ সাহেব দা.বা.**
(প্রিন্সিপ্যাল, শাইখ যাকারিয়া রিচার্স সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।)
আজ ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের শীর্ষ উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের যে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আহাম একটি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেকের কাছে আনন্দের হতে পারে তবে আমি খুব ব্যথিত। আজ হতে দশ বা পনের বৎসর আগে কল্পনাও করতে পারিনি, তাবলীগ কখনো নিয়ে এভাবে বসতে হবে। কেন আজ এই বিপদ? কেন এসব হচ্ছে? যে কাজ সারা দুনিয়ায় নিখুঁতভাবে চলছিল, যখনই এর উপর কোন দুশমন আঘাত হেনেছে উলামায়ে দেওবন্দ তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। আফসোস, আজকে সেই উলামায়ে কেরামকে পর মনে করা হচ্ছে, গালি দেয়া হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য কিতাব ফাতাওয়া আলমগীরীতে আছে, ব্যক্তিগত কোন দ্বন্দ্বের কারণে নয়, শুধুমাত্র আলেম হওয়ার কারণে কোন আলেমকে গালি দিলে কুফরী হবে। অর্থাৎ, যে গালি দিয়েছে তার ভেতরে কাফেরের বৈশিষ্ট্য আছে। একলোক সাতচল্লিশ বছর যাবৎ তাবলীগ করছে, পুরা জীবন কুরবানী করে দিচ্ছে, কিন্তু আলেমের ইজ্জত তার অন্তরে আসেনি।
মুরুব্বী উলামায়ে কেরাম ও তাবলীগের মুরুব্বীদের কাছে আমার আবেদন, আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। আমাদের এদেশকে চলমান ফিতনা, মারামারি-হাতাহাতি থেকে বাঁচাতে হলে নবীওয়ালা এই কাজ কাকরাইলের উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে চালাতে হবে। এখানে নিযামুদ্দীনের প্রয়োজন নেই, রায়বেন্ড মারকাযের প্রয়োজন নেই। আমরা নিযামুদ্দীন বুঝি না, রায়বেন্ড বুঝি না, আমরা কুরআন বুঝি, সুন্নাহ বুঝি, হক্কানী উলামায়ে কেরাম বুঝি। সুতরাং দীনের এ কাজ আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের মারকায কাকরাইল থেকে পরিচালনা করবো। তাহলেই এসব ফেতনা শেষ হয়ে যাবে।
এখানে হাজার হাজার মুফতী, উলামায়ে কেরাম উপস্থিত আছেন; আমরা সকলেই জানি যে, মুফতীরা ফাতাওয়ার শেষে লিখে দেন 'কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আমি জওয়াব লিখে দিলাম' বা 'প্রকৃত সঠিক বিষয়টি আল্লাহ পাক ভালো জানেন।' অর্থাৎ, কুরআন-হাদীস থেকে আমার যা বুঝে এসেছে তা লিখে দিয়েছি, ভুলও হতে পারে। কখনো শুনিনি যে, কোন ফাতাওয়ায় লেখা হয়েছে, 'এটাই একমাত্র সত্য কথা। পৃথিবীর সমস্ত মুফতীদের জিজ্ঞাসা করতে পারো, কেউ এর বিপরীত বললে সে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দালাল, আল্লাহ রাসূলের আযমত তার মধ্যে নেই।' এমনভাবে বলতে তো কাউকে কখনো দেখিনি। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেব কি করে এসব কথা বলতে পারলেন! এভাবে কথা বলে তিনি তো তার বক্তব্য পেশ করছেন না বা ফাতাওয়া দিচ্ছেন না; বরং মুফতীদেরকে গালি দিচ্ছেন।
ফাতাওয়ার মারকায হলো দারুল উলূম দেওবন্দ; ফাতাওয়ার মারকায নিযামুদ্দীন নয়। আর মাওলানা সাহেবও তো মুফতী নন, সুতরাং তিনি ফাতাওয়া দিলে তো এমন বে-উসূলী কথাবার্তা আর গালাগালিই প্রকাশ পাবে। মোটকথা, ফাতাওয়া তো দিবে দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার কৃতি সন্তানেরা; মুফতী আব্দুল মালেক, মুফতী দিলাওয়ার হুসাইন সাহেব প্রমুখ মুফতীরা। তাই এসব ফেতনার দিকে যাওয়ার দরকার নেই। আমি পায়ে ধরে বলি, ও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, ও ডাক্তার সাহেব! আমরা আপনাদের বাইরের লোক নই।
আমরা যেহেতু নামায পড়াই সেহেতু মিম্বর আমাদের, মেহরাব আমাদের, ইমামত আমাদের। ইমাম প্রথম কাতারে থাকেন আর তাবলীগের ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তাররা ইমামের পিছনে থাকেন। কাজেই 'উলামায়ে কেরাম বাইরের লোক, বাইরের লোকের লোকমা নেয়া যাবে না।'– এসব কথা বলে ধোঁকা দেয়া চলবে না। আমরা বলতে চাই– ইমাম আমরা, মিম্বর আমাদের, মেহরাব আমাদের, আমরা পরামর্শ দিবো, সিদ্ধান্তও আমাদেরটাই মানতে হবে।

**মাওলানা আবু তাহের সাহেব দা.বা.**
(নায়েবে মুহতামিম, পটিয়া মাদরাসা)
আমি পটিয়া মাদরাসার সম্মানিত মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম বুখারী সাহেবের প্রতিনিধিত্ব করছি। তিনি অসুস্থ থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি। সকলকে তিনি সালাম জানিয়েছেন। তিনি সকলকে একথা জানিয়ে দিতে বলেছেন, 'আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাসলাকের বাইরে যেতে পারবো না। দারুল উলূম দেওবন্দের সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারবো না। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. তাবলীগের যে নাহজ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন তার বাইরে আমরা যেতে পারবো না।'
কিছুদিন পূর্বে পটিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের এক ওয়াযাহাতি জোড়ে তিনি বলেন, আবু আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী অত্যন্ত বড় মাপের বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেতনার সম্মুখীন করেন তখন তার শাগরেদরা আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, খুব কান্নাকাটি করলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার হেদায়াতের ফায়সালা করলেন। তিনি আবার হেদায়াতের পথে আসলেন। আমরা কি সারা দুনিয়ার মানুষ দাওয়াত ও তাবলীগের এই পরিস্থিতিতে আল্লাহর তা'আলার কাছে দু'আ করতে পারি না?
মাওলানা সাদ সাহেব কুরআন-হাদীসের খেলাফ যেসব কথা বলছেন তার সংশোধনের জন্য এবং নিযামুদ্দীন থেকে যেনো সঠিক সিদ্ধান্ত আসে তার জন্যও কান্নাকাটি করা উচিত। আজকে এই দাওয়াত ও তাবলীগ সারা দুনিয়াতে শান্তির বাণী শুনিয়েছে। কোটি কোটি মানুষ এর উসিলায় হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের কী হলো যে আল্লাহ আমাদের উপর নারাজ?

এ কারণেই হযরত আব্দুল হালীম বুখারী সাহেব বলেছেন, আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের মধ্যে জোড় পয়দা করেন। আমাদেরকে যেন তিনি ভাঙ্গন থেকে হেফাজত করেন। আমি একথাটি বলেই বিদায় নিতে চাই, দাওয়াত ও তাবলীগ সারা দুনিয়ায় ফাযাইলে ইলম বর্ণনার উপর চলেছে। মাসাইল বর্ণনার উপর তাবলীগ চলেনি; তাবলীগ চলেছে ফাযাইল বর্ণনার উপর। তাবলীগের প্রতিটি তালীমের হালকায় বলা হতো, আমরা মাসাইলে ইলম শিখবো উলামায়ে কেরামের হালকা থেকে, আর ফাযাইলে ইলম শিখবো উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে। আজকে যে ফেতনা সারা দুনিয়ায় শুরু হয়েছে, তার একমাত্র কারণ মাসাইল বর্ণনা করা শুরু হয়ে গেছে। এই তাবলীগ মাসাইল দিয়ে চলতে পারে না। মাসাইলের জন্য রয়েছেন উলামায়ে কেরাম। মাসাইল উলামায়ে কেরামের কাছ থেকেই শিখতে হবে। মাঠে ময়দানে মাসাইলের বয়ান দ্বারা তাবলীগ চলতে পারে না। আমাদের আকাবির উলামায়ে কেরাম– যারা এ কাজের মুরুব্বী ছিলেন– তারা ফাযাইলের কথা শুনিয়েছেন। তারা আম ময়দানে মাসাইল বয়ান করেননি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সারা দেশের উলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন।

**মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা.**

(আমীনুত তা'লীম, মারকাযুদ্দাওয়া আল-ইসলামিয়া)

হামদ ও সালাতের পর...

প্রথম কথা হলো, বর্তমানে অনেক ভাইকে দেখা যায়, নিজেরা খুব গীবত-শেকায়েত করতে থাকেন, অপরকে গাল-মন্দ করতে থাকেন; কিন্তু উলামায়ে কেরামের উপর আপত্তি করেন যে, উলামায়ে কেরাম গীবত করেন।

আমাদের বুঝতে হবে, গীবত কাকে বলে। কোন আলেম, কোন মুফতী দীনী দায়িত্ব পালনের জন্য, শরয়ী হুকুম বলার জন্য যদি কারো ভুল-ত্রুটি উপস্থাপন করেন তাহলে এটাকে গীবত বলা হয় না। এটা তো শরয়ী দায়িত্ব। এটাকে বলে আন-নাসীহা– (হিতাকাঙ্ক্ষা ও সদুপদেশ)। একটা হলো আল-গীবাতু, আরেকটা হল আন-নাসীহাতু। আমাদের আকাবির উলামায়ে কেরাম যেটা করছেন সেটা হল, আন-নাসীহাতু। তাঁরা উম্মতের খায়েরখাহীর দায়িত্ব পালন করছেন। এটাকে গীবত নাম দেয়া না-জায়েয। উলামায়ে কেরামের এই আন-নাসীহা-কে যারা গীবতের নাম দিচ্ছে এবং এটার সমালোচনা করছে, যবান দারাযী করছে তারাই মূলত গীবত করছে।

দ্বিতীয় কথা, আজকাল একটা কথা খুব বলা হয় যে, মাওলানা সাদ সাহেব আমীর এবং আমীরের এতাআত (আনুগত্য) জরুরী।

আমীর কীভাবে হবে, আমীরের নির্ধারণ কীভাবে হবে এটা বুঝা জরুরী। কুরআন-সুন্নাহ, ফিকহে ইসলামী ও ফিকহ-ফতোয়ার যতো কিতাব আছে, সেগুলোর বাবুল ইমারাহ পড়ুন। সেখানে লেখা আছে, আমীর নির্ধারিত হয় তা'মীরের মাধ্যমে। অর্থাৎ, যারা (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) যিম্মাদার, যারা আহলুল হল ওয়াল আক্দ, তারা পরামর্শ করে কাউকে আমীর নির্ধারণ করলে সে আমীর হয়। নিজে (আমীরত্বের) দাবী করলে কেউ আমীর হয় না এবং অটোমেটিকও কেউ আমীর হয়ে যায় না। নিজে নিজে বা নিজের ঘোষণার মাধ্যমে আমীর হয়ে যাওয়া– ইসলামে এমন কোন বিধান নেই এবং এর কোন নযীরও (দৃষ্টান্ত) নেই। ইসলামে আছে তা'মীর। আবু দাউদ শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে আছে, (একবার) কয়েকজন (সাহাবী) সফরে যাচ্ছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'ফালয়ুআম্মির!' তোমরা যারা সফরে যাচ্ছো, তারা যেন সফরে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। তো এভাবে তা'মীরের মাধ্যমে (আমীর বানানোর মাধ্যমে) কেউ আমীর হয়।

হযরত মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ.-এর ইন্তিকালের পর ফায়সালদের শুরা চলছিলো– এটা স্বীকৃত কথা। এটা নিয়ে কারো কোন ইখতিলাফ নেই। এই পক্ষ, ঐ পক্ষ সবাই এ কথা জানেন। ফায়সালদের একজনের ইন্তিকাল হলো, দুইজনের ইন্তিকাল হলো, এভাবে অন্যান্য ফায়সালদের ইন্তিকালের পর হায়াতে আছেন মাওলানা সাদ সাহেব। এখন নতুন মাসআলা বানানো হয়েছে যে, কয়েকজন ফায়সাল থাকলে এবং অন্যান্যদের ইন্তিকাল হয়ে গেলে যিনি যিন্দা আছেন, তিনি অটো আমীর হয়ে যান। এটা বিদআতী মাসআলা। ভালো করে বুঝুন–এটা বিদআতী মাসআলা।

এরা আরেকটা নতুন মাসআলা বানিয়েছে যে, এতোদিন যারা শুরার মধ্যে ফায়সাল ছিলেন, সবাই আমীর ছিলেন। বলুন তো, একসাথে দুইজন, তিনজন আমীর ইসলামে আছে? এটাও এক বিদআতী মাসআলা যে, একসাথে তিনজন আমীর ছিলেন। আবার এটাও বিদআতী মাসআলা যে, এতোদিন যারা ফায়সাল ছিলেন, তাঁদের সবার ইন্তিকালের পর ইনি (সাদ সাহেব) অটো আমীর হয়ে গেছেন।

মোটকথা, আমীর হওয়ার সূরত হলো তা'মীর পাওয়া যাওয়া। অর্থাৎ, আহলুল হল ওয়াল আক্দ আমীর বানাবে। চাই মাশওয়ারা করে আমীর বানাক অথবা ইমারতের বাইআত গ্রহণ করুক। (সাদ সাহেবের ক্ষেত্রে) এই দু'টোর কোনটিই ঘটেনি। মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ.-এর ইন্তিকালের পর এই দু'টোর কোনটিই ঘটেনি। আহলুল হল ওয়াল আক্দ মাশওয়ারা করে সাদ সাহেবকে আমীর ত্বায় (নির্ধারণ) করেছেন– আমার জানা মতে এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি এবং এটা ঐ পক্ষের দাবীও নয়। অনুরূপভাবে (সাদ সাহেবের ক্ষেত্রে) আহলুল হল ওয়াল আকদের বাইআতও পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, যে বাইআত পাওয়া গেছে, তা আওয়ামের (সাধারণ জনগণের অর্থাৎ যারা আমীর বানানোর দায়িত্বশীল নন, তাদের) বাইআত। বিশাল ইজতিমা দেখে তিনি মাশওয়ারা ছাড়াই ইজতিমার মধ্যে বাইআত নিয়ে নিয়েছেন। এরকম বাইআত পীর সাহেব স্বীয় মুরীদদের থেকে নিতে পারেন। এরকম বাইআতের মাধ্যমে কেউ পীর তো হতে পারে; কিন্তু আমীর হতে পারে না। আওয়ামের বাইআত দিয়ে আমীর হয় না। আমীর হবে আহলুল হল ওয়াল আকদের তা'মীরের মাধ্যমে বা তাদের ইমারতের বাইআতের মাধ্যমে। এই দু'টোর কোনটিই এখানে (সাদ সাহেবের ক্ষেত্রে) পাওয়া যায়নি। সে জন্য মাওলানা সাদ সাহেব কর্তৃক দাওয়াত ও তাবলীগের আলমী আমীরের দাবী করা– এটা গলত; ইসলামী ফিক্হ-ফতোয়ার আলোকে বিলকুল সরীহ গলত (সুস্পষ্ট ভুল)। তো যখন আমীর হওয়াই গলত, তখন এতাআতের প্রশ্ন আসবে কোত্থেকে!? সে জন্য এই মৌলিক মাসআলাটি আমাদের সবার জানা থাকতে হবে।

রইল মারকায নিযামুদ্দীন অর্থাৎ, নিযামুদ্দীনের এতাআত। এখানে একটি কথা বুঝতে হবে যে, শরীয়তে স্থানের সম্মান আছে; মুক্বাদ্দাস মাকামাত আছে। কিন্তু কোন মাকামকে শরীয়ত কোথাও মুতা'অ (অনুসরণযোগ্য) বানায়নি।

আর মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ-(-এর এতাআতের বিষয়টি)। তো তিনি (বিভিন্ন ক্ষেত্রে) যেমন তার আকাবিরের তরীকা থেকে সরে গেছেন, তেমনি বিভিন্ন ফিকরী শুযুযের (চিন্তাগত বিচ্ছিন্নতার) শিকার হয়েছেন। ফলে অনেক বিষয়ে জমহুরের মুত্তাফাকা মাসলাকের (সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের) খেলাফ করেছেন। কারো মধ্যে এগুলো পাওয়া গেলে তো এমনিতেই তার এতাআত জায়েয নেই; সেখানে গলত মাসআলা আবিষ্কার করে আমীরত্বের দাবী করা এবং একথা বলা যে, এতাআত করতে থাকো, (আমার আনুগত্য করতে থাকো চাই এতে) মাসআলা যেখানে যায়,

যাক। নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক। এটা একেবারেই গলত তরীকা।
এই কাজ দীনের কাজ, ঈমানের কাজ। কাজেই দায়িত্বশীল ও কর্মী সবাইকে দীনী আহকামের তাবে (অধীন) থাকতে হবে। দীনী আহকামের খেলাফ করে ব্যক্তিবিশেষের জন্য আসাবিয়্যাত (চরমপন্থা) ইসলামী শিক্ষার একেবারে খেলাফ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আসাবিয়্যাত থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

**মাও. নূর হুসাইন কাসেমী সাহেব দা.বা.**

মুহতারাম হাজেরীন! আলহামদুলিল্লাহ, গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবকথাই বলা হয়ে গেছে। আমি সংক্ষেপে একটি ঘটনা বলছি–
হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানী মাদ্দাযিল্লাহুল আলী বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। হযরতের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি আমাকে বললেন, আমি বাংলাদেশে আসার আগে নিযামুদ্দীন সফরে গিয়েছিলাম এবং মাওলানা সাদ সাহেবের সাথে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা কথা হয়েছে। এই পৌনে এক ঘন্টার পুরাটা সময় তিনিই তার বক্তব্যই পেশ করে গেছেন, আমি শুধু শুনেছি। তার বক্তব্য শেষে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম– 'আপনি আমার একটি কথার উত্তর দিন, নিযামুদ্দীন মারকাযের যেসব আকাবির হযরত দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে মুকীম ছিলেন, তারা কেন আপনাকে ছেড়ে চলে গেলেন?' তিনি আমার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি। মাওলানা সাদ সাহেবের শ্বশুর মাওলানা সালমান সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষ থেকে এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তারপর আরশাদ মাদানী দা. বা. আমাকে (নূর হুসাইন কাসেমী) মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যপারে একটি মন্তব্য করলেন যে, 'এ লোকটি একেবারেই জাহেল, তিনি আলেম হতে পারেন না।'
হযরতের এ মন্তব্যের বাস্তব প্রমাণও আমরা সাদ সাহেবের কথাবার্তায় পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি। তিনি যে সব কথাবার্তা বলছেন, এগুলো কোন আলেমের কথা হতে পারে না এবং কোন অবস্থাতেই এগুলো মেনে নেয়া যায় না। আজকের এই মজমায় উলামায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্ত দিবেন আমরা সে অনুযায়ী চলবো। আমাদের এদেশে অন্য কোন মতাদর্শ চলবে না। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব দা.বা.**
(মুকীম, কাকরাইল মসজিদ)

হামদ ও সালাতের পর,
হযরত উলামায়ে কেরাম ও বেরাদারানে ইসলাম!
আমরা আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে দীনের নামে দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে এখানে একত্র হয়েছি। এখানে আমাদের দেশের শীর্ষ আকাবির উলামায়ে কেরাম তাশরীফ এনেছেন।
ভাই দোস্তো ! আমরা তাবলীগের সাথীরা বর্তমানে কয়েকটি ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে আছি। এগুলোর মাধ্যমে আসলে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে তাবলীগের কাজের পরিচয়টা বলছি–
হযরতজী ইলিয়াস রহ.-এর যামানা থেকে তাবলীগের মধ্যে ছয়টি সিফাত চলে আসছে–
এক. ঈমান তথা কালিমা।
দুই. নামায।
তিন. ইলম ও যিকির।
চার. একরামুল মুসলিমীন।
পাঁচ. তাসহীহে নিয়ত।
ছয়. তাবলীগ।
আমরা যারা তিনদিন, চিল্লা, তিনচিল্লার জন্য তাবলীগে বের হই, এমনকি আলেম-উলামা যারাই বের হন সকলেরই সবক এই ছয় নম্বর। তাবলীগে এই ছয় নম্বর ছাড়া অন্য কোন সবক দেয়া হয় না। জামা'আত বের হওয়ার আগে কাকরাইল মসজিদে যে হেদায়াত দেয়া হয় আমিও সেখানে হেদায়াতি কথা বলে থাকি। হেদায়াতি বয়ানে চারটি কাজের হেদায়াত দেয়া হয়। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে সময়টা চার কাজে বেশি বেশি লাগাতে হবে–
এক. দাওয়াত।
দুই. ইবাদত।
তিন. তিলাওয়াত।
চার. খিদমত।
সময় লাগানো শেষে যখন বাড়ি ফেরার সময় হয় তখন আবার দুই ঘণ্টা হেদায়াত দেয়া হয় যে, বাড়িতে গিয়ে সময়টা কিভাবে কাটানো হবে। তার মধ্যে পাঁচটি কাজের কথা বলা হয়– (এক) ঘরের তা'লীম। (দুই) মসজিদের তা'লীম। (তিন) রোযানা মেহনত। অর্থাৎ কিভাবে মহল্লার প্রতিটি মুসলমান নামাযী হয়ে যায়, পুরোপুরি দীনের উপর চলে আসে সে জন্য ফিকির ও মেহনত করা।
চার. সপ্তাহে দুই গাশত।
পাঁচ. মাসে তিনদিন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া।
আর এগুলো পুরা করার জন্য আরো দু'টি হেদায়াত দেয়া হয়–
এক. পাশের মহল্লায় গাশত করা।
দুই. মারকাযের শবগুজারীর আমলে শরীক হওয়া।
এছাড়া তো আর কিছুই বলা হয় না। আর হাদীসে আছে কবরে তিনটি সুওয়াল (প্রশ্ন) করা হবে–
এক. তোমার রব কে?
দুই. তোমার দীন কী?
তিন. তোমার নবী কে?
তদ্রুপ হাশরের ময়দানে প্রত্যেক বনী আদমকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে–
এক. জীবন কোথায় ব্যয় করা হয়েছে?
দুই. যৌবন কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে?
তিন. সম্পদ কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে?
চার. সম্পদ কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে?
পাঁচ. ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, ফরয ইলম শেখা হয়েছে কিনা, আর সে অনুযায়ী আমল হয়েছে কিনা?
ভাই দোস্তো! তাবলীগের ছয় সিফাত, তাবলীগে বের হওয়ার সময় চার হেদায়াতি কথা, বাড়ি ফেরার সময় পাঁচ কাজ, কবরের চার সুওয়াল আর হাশরের পাঁচ সুওয়াল– এছাড়া কি তাবলীগে আর কোন বিষয় বলা হয়? হয় না।
ভাই দোস্তো! কুরআন হাদীসের কোথাও কি একথা আছে যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা কাউকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন– তোমাদের বিশ্ব আমীর কে ছিলো? অথবা তোমাদের বিশ্ব শুরা কে ছিলো? কোনদিন কি কোন আলেম একথা বলেছেন? তাহলে আজকে কেন আমরা তাবলীগের ভাইয়েরা এটাকে কেন্দ্র করে বিরোধে জড়িয়ে পড়লাম। কেন আমরা দ্বিধান্বিত হয়ে পরলাম? কেন আমরা একই মসজিদের সাথীরা দুইভাগ হয়ে পড়লাম? অবস্থা এমন যে, এখন কেউ কাউকে সালাম পর্যন্ত দিতে পারছি না। আমাদের ছয় নাম্বারের কোথাও তো এটা নেই। তাবলীগের তারতীবে ইমারতের (আমীর হওয়ার) বিষয়টি তো মূলত ছিলো, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের জন্য। আর সেটাও এভাবে যে, জামা'আত শেষ তো আমীরের ইমারতও শেষ।
এবার দেখুন, আমীরের বিষয়কে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে আম ভাইদের মধ্যে এখন একথা চালানো হচ্ছে যে, 'এদের আমীর কে? যাদের আমীর নেই তাদের আমীর শয়তান।' আজকে ওরা সবার মাঝে ব্যাপকভাবে এ কথাই প্রচার করছে। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, বাংলাদেশের তাবলীগের আমীর কে ছিলেন? আপনারা বলবেন, বড় হুযুর হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব রহ.। এবার আমার প্রশ্ন হলো, তার ইন্তিকালের পর বাংলাদেশের আমীর কে ছিলেন? কেউ ছিলেন না। তো আজকে যারা এসব কথা বলছে তাদের কী হুঁশ আছে যে, তারা কী বলছে? কারণ বড় হুযূর আব্দুল আযীয সাহেবের পর কেউ আর বাংলাদেশের আমীর নির্ধারিত হননি। এখন তো তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের আমীরও শয়তান সাব্যস্ত হয়। কেননা মরহুম হযরতের পর আর কেউ আমীর

ছিলেন না। এরপরের প্রশ্ন হল, হযরতজী ইনআমুল হাসান রহ. ইন্তিকাল করেছেন ১৯৯৫ সনে। তার ইন্তিকালের পর হিন্দুস্তানের আমীর কে ছিলেন? আর আমীর বানানোর পদ্ধতি তো শরীয়তে রয়েছে, যা একটু আগে মুফতী সাহেব (মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব) বলে গিয়েছেন। তো এবার বলুন, হযরতজীর ইন্তিকালের পর থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত হিন্দুস্তানের আমীর কে ছিলেন? সুতরাং তাদের কথা (যার আমীর নেই তার আমীর শয়তান) যদি সঠিক হয় তাহলে তো ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভারতের আমীরও ছিল শয়তান! আর এদিকে বাংলাদেশের আমীরও ছিল শয়তান!!

তাই আমি বলি কী, শয়তান তো এ পর্যন্ত ভালোই চালাচ্ছিলো। কিন্তু আপনারা (এতায়াতের দাবীদাররা) সেই শয়তান তাড়াতে গিয়ে কেন মারকাযে মারকাযে ঝগড়া সৃষ্টি করলেন? কেন সমগ্র বাংলাদেশে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন? ইতোপূর্বে পৃথিবীর কোথাও তো এমন হয়নি যে, তাবলীগের সাথীরা পরস্পরে মারামারি, ঝগড়াঝাটি করেছে। তাহলে আমরা কেন আজ এসব করছি? কেন আমরা তাবলীগের লোকেরা উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছি? আপনারা শুনে রাখুন, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের আমীর শয়তান না। হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয রহ.-এর ইন্তিকালের পর বাংলাদেশে কাজ চালানোর জন্য 'শুরায়ী নেযাম' বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কখনো শুরার সাথী কমেছে তো সাথে সাথে তা পূর্ণ করা হয়েছে। এখন বর্তমান শুরায় ছয়জন সাথী রয়েছে।

এতদিন আমাদের এই শুরা বাংলাদশের জন্য মাশওয়ারা করে যখন যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে আমরা সকলে সে মাশওয়ারা মেনে নিয়েছি। আর এই মানার নামই হলো 'এতায়াত'।

এখন ভিন্নভাবে ভিন্ন কিছু তুলে ধরে 'এতায়াত' নাম দেয়া হলে সেটা এতায়াত না; সেটা হলো 'ফেতনা'।

আমরা আলহামদুলিল্লাহ, এতোদিন যাবত সঠিকভাবে এতাআত করে আসছি বলে আমাদের মধ্যে কোন ফেতনা হয়নি। আর হিন্দুস্তানে কেন ফেতনা শুরু হলো? হিন্দুস্তানেও হযরতজীর ইন্তিকালের পর শুরায়ী জামাআত বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আর হযরতজীর জীবদ্দশায় চারজনের উপর যিম্মাদারী নিযুক্ত ছিলো। তাদের সাথী যখন কমেছে তখন নির্ধারিত নিয়মানুসারে সেই কোটা পূরণ করা হয়নি। নতুন সাথী নেয়ার আলোচনা উঠলেও এটা-সেটা বলে বলে সাথী আর বাড়ানো হয়নি। এভাবেই সেখানে ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে আমাদের এদেশে কিন্তু কোন ফেতনা ছিলো না; বরং সেখানকার চলমান ফেতনা আমরা কিছু লোক এদেশে টেনে এনেছি। কাজেই ওরা যে আমাদের ব্যাপারে বলে, আমাদের কোন আমীর নেই। এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক কথা নয়।

দ্বিতীয় কথা হলো, ওরা বলে বেড়াচ্ছে যে, আমরা নাকি নিযামুদ্দীন মানি না। কথাটা একটু চিন্তার বিষয়।

ভাই দোস্তো! কাকরাইলের মাওলানা জুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবীউল হক সাহেব, মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব, মাওলানা হুসাইন সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেবসহ আরো আমরা যারা মৌলবী আছি, আমরা সকলেই কিন্তু নিযামুদ্দীন মানি। তবে ওদের নিযামুদ্দীন মানা আর আমাদের নিযামুদ্দীন মানার মধ্যে ব্যবধান আছে। আসল কথা হলো, হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ., হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. তথা তিন হযরতজী যে তরীকায়, যে নাহজে এবং যে ধারায় তাবলীগের কাজকে যেভাবে রেখে গেছেন আমরা সেই নিযামুদ্দীনের উপর আছি এবং সেই নিযামুদ্দীন থেকে আমরা একচুলও সরে আসিনি।

উদাহরণত তৃতীয় হযরতজীর ইন্তিকালের পর দশজন শুরা সদস্যের সকলের উপস্থিতিতেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো—

(এক) তিন হযরতজী তাবলীগের যাবতীয় কার্যক্রম উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমেই সিদ্ধান্ত করায় হযরতত্রয়ের ইন্তিকালের পর এই কাজের তারতীবে বিন্দুমাত্র বাড়ানো-কমানো যাবে না।

(দুই) নিযামুদ্দীন মারকাযের ভিতরে কেউ বাইআত গ্রহণ করতে পারবে না। এই কারণেই হযরত যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. ও স্বীয় পিতা হযরত ইনআমুল হাসান রহ.-এর খলীফা হওয়া সত্ত্বেও যখনই কেউ বাইআত হওয়ার জন্য তার কাছে গিয়েছেন, তিনি সাফ বলে দিয়েছেন, 'এখানে বাইআত হবে না। আমি নিজেও বাইআত নিষিদ্ধ হওয়ার সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তাই নিযামুদ্দীনে আর একাজ চলবে না। আমি ছাড়া অন্যান্য মাশাইখ যারা আছেন তাদের কারো কাছে বাইআত হয়ে আমার থেকে পরামর্শ নিতে পারেন।'

বলেন, এখন যদি আমরা উক্ত শুরার সেই সিদ্ধান্তের উপর নতুন কিছু বাড়িয়ে দেই তাহলে কি নিযামুদ্দীন মানা হবে? এটা কি আহলে শুরাকে অমান্য করা হলো না? তাহলে আজকে যারা নিযামুদ্দীন মানার দাবীদার তারা কি আসলে নিযামুদ্দীন মানছে? তারা তো আহলে শুরার ফায়সালাকেই পরিবর্তন করে ফেলেছে।

এমন আরো কিছু কথা এখন আম সাথীদের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে, যেগুলো মানা হলে কুরআন-হাদীসই মানা হবে না। সেগুলো থেকে দুই-একটা বলছি—

مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے

'মসজিদের বাইরে দাওয়াত দেয়া সুন্নাতের খেলাফ।'

একথাটা কতটুকু সঠিক? কতটুকু হাদীস সম্মত? নবী-রাসূলগণ কি মসজিদের ভিতরে দাওয়াত দিয়েছেন, না বাইরে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কি ফেরাউনকে মসজিদের ভিতরে দাওয়াত দিয়েছেন, না তার রাজপ্রাসাদে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন? তাছাড়া যে সাহাবীর আমল দ্বারা ঐ কথার দলীল দেয়া হচ্ছে, সেই সাহাবী নিজেই তো মসজিদের বাইরে দাওয়াত পেয়ে নিজ গোত্রে ঈমান এনেছিলেন। তাহলে (সাদ সাহেবের কথা অনুযায়ী) তো এই সাহাবী নিজেই খেলাফে সুন্নাত আমলে সম্পৃক্ত হয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ। তো সেই সাহাবীর আমল দ্বারা কি দলীল দেয়া যাবে?

দ্বিতীয়ত তিনি যখন মসজিদে এসেছেন, এক্ষেত্রে স্পষ্ট বর্ণনা হলো, তিনি দেখলেন, শুধু তা'লীমের হালকা আর যিকিরের হালকা চলছে। তো এ হাদীস দ্বারা 'মসজিদের বাইরে দাওয়াত দেয়া সুন্নাতের খেলাফ' এ দলীল দেয়া কী করে সঠিক হয়?

দোস্তো! এখন আপনারা বলেন, আমরা কি এসব কথা এদেশের সাথীদের মধ্যে চালিয়ে দিবো? প্রচার করতে থাকবো? কথা কুরআন-হাদীসের খেলাফ হলেও কি চালিয়ে দিবো? নিযামুদ্দীন থেকে এসেছে বলে কি কুরআন-হাদীসের আলোকে যাচাই করে দেখতে হবে না? শুধু এই একটাই নয়, এমন ৫০টা কথা পেশ করা যাবে, যেগুলো নিযামুদ্দীন থেকে বলা হয়েছে অথচ কুরআন-হাদীস-বিরুদ্ধ কথা। তারপরও কি আমরা এই নিযামুদ্দীন মানতে থাকবো?

আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার—(আল্লাহ তা'আলা উলামায়ে কেরামকে জাযায়ে খায়ের দান করুন) উলামায়ে আহলে হক যদি এসব বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক না করতেন তাহলে আমাদের আম সাথীদের জাহালত কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

আজকে বলা হচ্ছে, আমরা তাবলীগ পেয়েছি নিযামুদ্দীন থেকে তাই কাকরাইল মানা যাবে না। আমি বলি যে, না, নিযামুদ্দীন থেকে পাইনি; আমরা তাবলীগ পেয়েছি কাকরাইল থেকে। বাংলাদেশের সাথীদের কাছে কি নিযামুদ্দীনওয়ালারা গাশত করেছে, না কাকরাইলওয়ালারা

করেছে? কাকরাইল মসজিদে ক্ষুধার্ত থেকে থেকে কি হিন্দুস্তানওয়ালারা মেহনত করেছিল, না কাকরাইলের হযরত মুনীর সাহেবরা দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত থেকে কুরবানী পেশ করেছিলেন?

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কাকরাইলওয়ালারা কোথা হতে তাবলীগ পেয়েছে? যদি বলা হয় তারা নিযামুদ্দীন থেকে পেয়েছে। তাহলে তখন আরেকটি প্রশ্ন উঠবে যে, 'তাবলীগ কি নবীওয়ালা মেহনত, না নিযামুদ্দীনওয়ালা মেহনত? আর নিযামুদ্দীনই বা কোথা হতে তাবলীগ পেয়েছে?' যদি বলা হয়, নিযামুদ্দীনওয়ালারা মদীনা থেকে পেয়েছে। তাহলে আমরা বলবো– যদি কাকরাইলওয়ালারা নিযামুদ্দীন থেকে পাওয়ার কারণে কাকরাইল বাদ হয়ে যায় তাহলে নিযামুদ্দীনওয়ালারাও মদীনা থেকে পাওয়ার কারণে নিযামুদ্দীন বাদ পড়ে যাবে। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই বাদ পড়ার কারণ এক। মোটকথা, তাদের দাবী মানা হলে কাকরাইল যেমন মানা যাবে না, তেমন নিযামুদ্দীনও মানা যাবে না।

ভাই দোস্তো! এসব অবান্তর কথা বলে আমাদের ভাইদেরকে হক থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'আমরা দেওবন্দ থেকে তাবলীগ পাইনি। নিযামুদ্দীন থেকে তাবলীগ পেয়েছি। তাই দেওবন্দ মানা যাবে না।' আমি জিজ্ঞেস করি, হযরতজী ইলিয়াস রহ. কোথায় পড়েছেন? উত্তর আসবে, তিনি তো দেওবন্দে পড়েছেন। শুনুন, তিনি শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমূদুল হাসান রহ.-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন শাইখুল হিন্দের কাছে আসতেন, শাইখুল হিন্দ বলতেন,

الیاس سے صحابہ کی بو آری ہے

ইলিয়াস থেকে সাহাবীদের ঘ্রাণ আসছে। তাছাড়া তাবলীগের ছয় নম্বরের একটি হল, اکرام المسلمین (ইকরামুল মুসলিমীন) হযরতজী প্রথমে এই 'ইকরামুল মুসলিমীন'-কে اکرام العلماء (ইকরামুল উলামা) হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। আকাবিরীনে দেওবন্দ এটা দেখে বললেন, এই নাম রাখা হলে শুধু এক তবকার একরাম যিন্দা হবে, অন্যান্য সব তবকা বাদ পড়ে যাবে। হযরতজী বললেন, তাহলে কী হবে? উলামায়ে দেওবন্দ বললেন, اکرام المسلمین (ইকরামুল মুসলিমীন) হলে সব তবকা শামিল হয়ে যাবে। তারপর হযরতজী ইকরামুল মুসলিমীনকে ছয় নম্বরের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এটাও তো উলামায়ে দেওবন্দই করেছে। তাই আপনি নিজীমুদ্দীন থেকে তাবলীগ পেয়েছি বলে খোদ দেওবন্দকেই অস্বীকার করে দিবেন এটা কিভাবে সঠিক হবে? কী বলেন, আমার তাবলীগী ভাইয়েরা?

আজকে কিছু লোক বলছে, 'ফাতওয়া হলে উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করবো আর তাবলীগী বিষয় হলে সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করবো।' আচ্ছা, বলেন তো, তাবলীগের কাজ দীনের কাজ কিনা? যদি তাবলীগী কাজকে আপনি দীনের কাজ মনে করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তাবলীগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয় উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। আর যদি বলেন, তাবলীগের কাজ দীনের কাজ না, তাহলে আপনি রিক্সাওয়ালা কিংবা যে কোন চিল্লাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলে আমাদের কী করার আছে!

আরে ভাই! আমরাই তো এতোদিন বলে আসছি যে, উলামায়ে কেরাম আমাদের মাথার তাজ। তাদেরকে আমাদের ইস্তিকবাল করতে হবে। এতোদিন আমরা ঠিকমত কাজ করছিলাম বলে তাদের আসতে হয়নি। কাজেই তারা আমাদের সমর্থন করেছেন, দু'আ করে দিয়েছেন এবং তাদের সাধ্যমত সময়ও দিয়েছেন। কারণ, দীনের কাজ তো শুধু এই একটাই না, দীনের কাজ তো আরো আছে। যখনই উলামায়ে কেরামের সাথে আমাদের আওয়াম সাথীদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে, আমরা দীন থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি, ভুল করতে শুরু করেছি তখনই উলামায়ে কেরাম চলে আসলেন, আমাদের ইসলাহ করে দিলেন। আর এখন আমারই বলছি, এতোদিন উলামায়ে কেরাম কোথায় ছিলেন? এতোদিন আসেননি কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভাই দোস্তো! এই হালতে যদি আমরা উলামায়ে কেরামকে কবুল না করতে পারি, তাদেরকে মেনে নিতে না পারি তাহলে বুঝতে হবে তাবলীগ দ্বারা এখনো আমাদের ইখলাস পয়দা হয়নি, হক কবুল করার যোগ্যতা এখনো আমাদের মধ্যে পয়দা হয়নি।

তাই এতোদিন আমরা যা বলে আসছি তার উপরই আমাদের আমল করা উচিত। মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা থেকে আমাদের বাঁচা উচিত।

ভাই দোস্তো! শেষকথা হল, আমাদেরও আমীর আছে, আমরাও নিযামুদ্দীন মানি। তবে আমরা আসল ধারার (তিন হযরতজী কাজকে যে নাহজের উপর রেখে গেছেন সেই) নিযামুদ্দীন মানি। তিনি তো (মাওলানা সাদ সাহেব) আসল ধারার নিযামুদ্দীন মানেন না। কাজেই উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে যেভাবে বলবে আমাদেরকে সেভাবে চলতে হবে। আমরা উলামায়ে কেরামের সঙ্গে থেকেই এই কাজ করবো। করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ তাওফীক দান করেন। আমীন।

**মাও. রুহুল আমীন সাহেব দা.বা. গওহরডাঙ্গা**

আজকে এই মজমা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্ত পাবো সেটা হবে ইজমায়ী সিদ্ধান্ত। ইজামায়ী ফায়সালার বিপরীতে চলা জুলুম। সুতরাং এই ইজমায়ী ফায়সালার বিপরীতে যে চলবে, তাকে এই জুলুমে অংশ নিতে দেয়া হবে না। আল্লাহর নবী বলেছেন,

انصر أخاك ظالما أو مظلوما

অর্থ : তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করবে, চাই সে জালেম হোক বা মজলুম হোক। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মজলুমকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝি, কিন্তু জালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? নবীজী বললেন, জালেমকে জুলুম থেকে বিরত থাকার জন্য ধরে বসবে, এটাই হবে তাকে সাহায্য করা।

এখন আমাদের যে ভাইয়েরা তাবলীগের ছয় নম্বরের মধ্যে 'নিজামুদ্দীন বা সাদ সাহেবের এতাআত' নামে আরেক নম্বর বাড়িয়ে দিচ্ছেন, ছয় নম্বরকে সাত নম্বরে পরিণত করছেন, আমরা তাকে এই জুলুম করতে দেবো না।

বাংলাদেশের সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত হয়ে আজকে যে সিদ্ধান্ত দিবেন, সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার আমাদের দেশে তাবলীগের মেহনত পরিচালনা করব। রাজি আছি না ভাই ইনশাআল্লাহ? স্পষ্ট ভাষায় বলছি, আমাদের দেশে সাত নম্বর চলবে না। এখানে এতাআতি জামাআত, হাতাহাতি জামাআত চলবে না। এখানে চলবে হযরতজী ইলিয়াস রহ., হযরতজী ইউসুফ রহ. এবং হযরতজী ইন'আমুল হাসান রহ.-এর রেখে যাওয়া নাহজের উপর চলনেওয়ালী জামাত। হাদীসে এসেছে,

اتقوا فراسة المؤمن

অর্থ : মুমিনের দূরদর্শিতা সমঝে চলো। হযরতজী ইন'আমুল হাসান রহ. তার ঈমানী ফেরাসাত ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে যে শুরায়ী নেযামের ওপর এ কাজকে রেখে গেছেন, আজকে আমাদের উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের পর সে নাহজ ও পদ্ধতিতেই এদেশে তাবলীগ চলবে। এ ব্যাপারে অন্তত বাংলাদেশে কোন দ্বিমত থাকতে পারবে না। কেউ যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের বর্তমান নিযামুদ্দীনের বদনেযামকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে তার হাত ধরে বসতে হবে। তাকে ফাসাদ সৃষ্টি করতে দেয়া যাবে না। আজকে এখান থেকে আমরা যে ফায়সালা নিয়ে যাবো উলামায়ে কেরাম, আওয়াম-খাওয়াস নির্বিশেষে সকল তাবলীগী সাথীর সমন্বয়ে তা উজুদে আনতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। **(২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

## ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে মাখযানুল উলূম মাদরাসায় প্রদত্ত

# হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. এর বয়ান

**বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম**

পটভূমি :

*[হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর হুকুমে যামানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. চল্লিশ বছরের অধিককাল মদীনা মুনাওয়ারায় তাবলীগের আমীর হিসেবে যিম্মাদারী পালন করেছেন। তিনি বর্ণনাতীত কুরবানীর সাথে মেহনত করে গোটা বিশ্বকে দাওয়াতের মেহনতের ময়দান বানিয়েছেন। অতঃপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবরস্থান মদীনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাক্বীতে আপন কবর রচনা করেছেন।*

*জান্নাতুল বাক্বীর মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করে বরাবর শেষ মাথায় পৌঁছার আট কবর আগে, তিন কবর বামে দীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দাঈ ইলাল্লাহ বিশ্রামে রয়েছেন।*

*১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে টঙ্গীতে পুরানাদের জোড় উপলক্ষে আগমন করে তিনি তিন দিনে চারটি মাদরাসা যিয়ারতে যান। তিনি প্রতিটি মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে বিনয়াবনত হয়ে মুযাকারার সুরতে আসাতিযায়ে কিরাম ও তালিবুল ইলমদের উদ্দেশে অত্যন্ত জরুরী বয়ান পেশ করেন।*

*২৪ আগস্ট ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, মাদরাসা যিয়ারতের দ্বিতীয় দিনে তিনি ফরিদাবাদ মাদরাসা যিয়ারতে যান। এর বৃত্তান্ত রাবেতার মার্চ-এপ্রিল ২০১৮ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। আর ২২ আগস্ট ১৯৮৯ মঙ্গলবার, মাদরাসা যিয়ারতের প্রথম দিনে যিয়ারতকৃত দু'টি মাদরাসার মধ্য হতে বারিধারা মাদরাসা যিয়ারতের বিবরণ রাবেতার মে-জুন ২০১৮ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।*

*আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে এখন মাদরাসা যিয়ারতের প্রথম দিনে যিয়ারতকৃত অপর মাদরাসা– মাখযানুল উলূম-এর যিয়ারত-বৃত্তান্ত ও বয়ান পেশ করার চেষ্টা করব।]*

# # #

বারিধারা মাদরাসা হতে কাকরাইল ফেরার পথে আমরা হযরতের সঙ্গে খিলগাঁও চৌরাস্তা জামে মসজিদ সংলগ্ন মাখযানুল উলূম মাদরাসা যিয়ারতে গেলাম। মুহতামিম সাহেবের সঙ্গে সালাম, মুসাফাহা ও সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় শেষে হযরত মাওলানা সাঈদ খান সাহেব রহ. আসাতিযায়ে কেরামসহ তলাবাদের মজমায় ০১:৫৩ হতে ০২:৫৩ পর্যন্ত এক ঘণ্টা বয়ান করেন। বয়ানের শুরুতে খুৎবায়ে মাসনূনার পর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অর্থ : মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। এরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আনফাল-২-৪)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ: আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করেন। (সূরা ফাতির-২০)

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ইলমে আরো উন্নতি দান করো। (সূরা ত্বহা-১১৪)

আয়াতসমূহ তেলাওয়াতের পর তিনি নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করেন–

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ

অর্থ : যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোন একটি পথ অবলম্বন করল, আল্লাহ তা'আলা তার বেহেশতের পথ সহজ করে দেন। (সুনানে তিরমিযী, হা.নং ২৬৪৭)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

অর্থ : যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে বের হলো (সেখান হতে) ফেরা পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হবে। (আল-মু'জামুস সগীর লিত-তাবারানী, হা.নং ৩৮০)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُقَالُ يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন (কেয়ামতের দিন) কুরআনওয়ালাকে বলা হবে, কুরআন শরীফ পড়তে থাক আর জান্নাতের মর্তবাসমূহে আরোহন করতে থাক এবং থেমে থেমে পড়, যেমন তুমি দুনিয়াতে থেমে থেমে পড়তে। তোমার স্থান সেখানে হবে যেখানে তোমার শেষ আয়াতের তিলাওয়াত খতম হবে। (সুনানে তিরমিযী, হা.নং ২৯১৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (সহীহ মুসলিম, হা.নং ২২৪)

(অতঃপর বলেন,)

ভাই দোস্ত আওর বুযুর্গ!

আল্লাহ তা'আলা খাছ ফযল তথা বিশেষ অনুগ্রহেই কাউকে ইলমের তালীম-তা'আল্লুমে মশগুল করেন, শেখা ও শেখানোয় লাগিয়ে দেন। ফয়যে ইলাহী আ'ম (ব্যাপক)। এতে মুমিন-মুত্তাকী, কাফির, মুশরিক, মুলহিদ, ফাসিক সবাই শরীক। কিন্তু ফযলে ইলাহী খাছ (নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের জন্য সুনির্দিষ্ট)। ফযলে ইলাহী আ'ম নয়, ফয়যে ইলাহী আ-ম।

এক কবি বলেন–

*যব খোদা তাওফিক না দে,*
*ফয়যে ইলাহী আ'ম সাহী;*
*মাগার ফযলে ইলাহী আ-ম নেহী।*

সবার উপর আল্লাহ তা'আলার ফয়য বিস্তৃত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ফযল খাছ জিনিস, যা তিনি খাছ লোকদেরকে দান করেন।

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থ : এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। (সূরা জুমু'আ-৪)

তাই আপনাদের বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা দরকার। কারণ তিনি আপনাদেরকে তার ইলমের কাজে লাগিয়েছেন। আমরা দীন শিখতে বের হয়েছি। ঈমান, নামাজ, ইলম, যিকির, আখলাক, ইখলাস শিখতে এবং দীন ফায়লানো (দীনের প্রচার-প্রসার) শিখতে বের হয়েছি। সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমও দীন শিখতে ও ফায়লাতে বের হয়েছেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ আনলেন। সেখানে তখন দু'টি হালকা (মজলিস)

চলছিল। এক হালকায় কুরআন পড়া হচ্ছিল। আরেক হালকায় আহকামাত শেখা হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে কুরআনের হালকায় গেলেন, তারপর আহকামাত শেখার হালকায় গিয়ে বসে গেলেন। বললেন, দু'টি হালকা-ই ভাল কাজে নিরত আছে। তবে আমাকে মু'আল্লিম (শিক্ষক) করে পাঠানো হয়েছে। যিকিরের হালকা ব্যক্তির জান্নাত বানাচ্ছে। আর তা'লীমের হালকা হাজারের জান্নাত বানাচ্ছে। নবীজী ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে, যেন আখলাক দুনিয়াতে উঁচা হয়ে যায়। (সুনানে কুবরা বাইহাকী, হা.নং ২০৭৮২)

ইসলামে সবচেয়ে বড় জিনিস হল আখলাক। তাই জান্নাতে সবচেয়ে বড় মর্তবা আখলাকের–

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

অর্থ : আমি জান্নাতের কিনারায় একটি ঘরের যিম্মাদারী নিলাম ঐ ব্যক্তির জন্য যে হকের উপর থেকেও ঝগড়া করে না, অধিকার ছেড়ে দেয়। আমি জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদারী নিলাম ঐ ব্যক্তির জন্য যে ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা বলে না। আমি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে (ফেরদাউসে) একটি ঘরের জামিন হলাম ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার আখলাক সুন্দর করে। (আবু দাউদ, হা.নং ৪৮০০)

কুরআন হাদীসের ইলম ঝগড়া থেকে বাঁচায়, মিথ্যা থেকে বাঁচায়, আখলাক উঁচা করে। আর যার আখলাক উঁচা তার সম্পর্কে বলা হয়েছে خير الناس من ينفع الناس সে-ই সবচেয়ে ভালো মানুষ যে সবাইকে নাফা দেয় (উপকার করে) কাউকে লোকসান দেয় না (ক্ষতি করে না)।

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ : যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও ৩মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

আখলাকওয়ালা গোস্বা হজম করে, মাফ করে দেয়, বদলা নেয় না। যতই কষ্ট দিক, সে মাফ করে দিবে। এ ইলম দুশমনকে দোস্ত বানাবার তরীকা শেখায়।

অনেক সময় ভাইয়ের সাথে, পড়শীর সাথে দুশমনী হয়ে যায়, কাফেরের সাথে দুশমনী হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এর সমাধানে কুরআনে কারীমে একটি তাবীয বাতলে দিয়েছেন...। (একথা বলার সাথে সাথে মুহতামিম সাহেব ও কতিপয় আসাতিযায়ে কেরামের ইশারায় উপরের জামা'আতের কতিপয় তালিবে ইলম কাগজ কলম হাতে তাবীযটি লিখে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু তিনি কোন তাবীয লেখার কথা না বলে বললেন,)

ছেলে অবাধ্য হয়েছে, অমুকে দুশমন হয়েছে এজন্য আমরা তাবীয চাই, কিন্তু আল্লাহর বাতানো তাবীয ব্যবহার করি না। কারণ, আল্লাহর বাতানো তাবীযের উপর আমাদের এ'তেমাদ (ভরসা) নেই। আল্লাহর দেয়া তাবীয মানি না, কারণ এই তাবীযটি আমলী (কর্মসংক্রান্ত)। আর কাজ করা তো বিলকুল মুশকিল! পক্ষান্তরে লেখা তাবীয তো খু-উ-ব আসান, গলায় বা বাহুতে ঝুলিয়ে নিলেই হল!

(তারপর তাবীযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,)

এবার দেখেন, কী বলেছেন আল্লাহ–

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থ : ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। তার ফল হবে এই যে, যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরা হা-মী-ম আস-সাজদাহ-৩৪)

নেকী ও বদী বরাবর নয়। যে দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে ইহসান (অনুগ্রহমূলক সদাচরণ) কর। তার খারাপ ব্যবহার দফা (প্রতিরোধ) কর ভাল ব্যবহার দ্বারা। এ আমল করলে আল্লাহ কী করবেন? তার ও তোমার শত্রুতা দূর করে বন্ধুত্ব গড়ে দিবেন। তার দিল থেকে শত্রুতা দূর করে মহব্বত পয়দা করে দিবেন। (তারপর তিনি প্রশ্ন করেন,) আল্লাহর বাতানো এ আমলী তাবীয নেয়ার জন্য কেউ প্রস্তুত আছে কি?

দোস্ত বুযুর্গ! এটা সেই ইলম যা আকল-বুদ্ধি বাড়ায়।

এক মুসল্লী প্রশ্ন করল, চার রাকআতী নামাযের প্রথম বৈঠকে ভুলে দুরূদ শরীফ পড়লে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় কেন? সাজদায়ে সাহু দিতে কি কষ্ট হয় না? দুরূদ শরীফ কি এমন জিনিস যা পড়লে কাউকে কষ্ট দেয়া যায়, শাস্তি দেয়া যায়? ইমাম সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন, দুরূদ শরীফ কি এমন জিনিস যা ভুলে কিংবা অমনোযোগিতার সাথে পড়া যায়? বস্তুত দুরূদ পড়ার কারণে শাস্তি না, শাস্তি এ কারণে যে, দুরূদের মতো শানদার জিনিস সে বেখেয়ালে পড়ল কেন? ব্যস, মুসল্লী লা-জওয়াব।

একলোক বিবির সঙ্গে ঝগড়া করে বলল, সকাল (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা না বললে তোমাকে তিন তালাক। বিবি তো খুশি, এমন একটা সুযোগই সে খুঁজছিল। কিন্তু লোকটি অনুতপ্ত। আফসোস করছে যে, হায়, সকালের আগে কথা না বললে তো বিবি গেল! কেউ তাকে পরামর্শ দিল ইমাম সাহেবের কাছে যাও। সে গিয়ে বলল, হুযূর এই এই ব্যাপার, এখন কী ব্যবস্থা? সুবহে সাদিক পর্যন্ত কথা না বললে বিবি গেল! তার সঙ্গে তো আমার অনেক মহব্বত! ইমাম সাহেব বলেন, ঘাবড়াও মাত, মুআযযিনকে ডেকে আন। ইমাম সাহেব মুআযযিনকে বলে দিলেন, আজ ফজরের আযান এক ঘণ্টা আগে দিও। পরে আবার সময়মতো আযান দিয়ে দিও। প্রথমবার আযান হলে বিবি খুশিতে বলে উঠল, বেঁচে গেলাম, তিন তালাক তো পড়ে গেল। স্বামী বলে, রাখো তোমার তালাক, এখনও সুবহে সাদিক হয়নি, আযান সময়ের আগে দেয়া হয়েছে। সকালের আগে কথা বলার কারণে তুমি এখনও আমারই রয়ে গেছো!

বলছিলাম, এটা সেই ইলম যা আকল-বুদ্ধি বাড়ায়। কখন? যখন জান্নাত, আখিরাত সামনে রেখে চলবে। যখন ভুকা-ফাক্কা, যিল্লতি আর ছেঁড়া কাপড়ের কষ্ট বরদাশত করবে। এক তালিবে ইলম সাহাবী অনাহারে আছেন। হযরত উসমান রা., আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা., কায়েস রা., সা'দ ইবনে উবাদা রা.-ও সেখানে আছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বলেননি, একে খানা দাও। অভ্যাস করিয়েছেন যে, অনাহারে ইলম হাসিল করলে ইলমের কদর হবে। ইলম ফায়লাতে পারবে। অনাহারে ইলম হাসিল না করলে একহাজার টাকায় খিদমতকারী পনেরো শ'/ দুই হাজারের ডাক পেলে সেখানে চলে যাবে। সম্পদ তাকে চক্কর কাটাবে। পক্ষান্তরে অনাহারে ইলম হাসিল করলে বলবে, না, আমি তো আল্লাহ থেকে নেব, তোমার থেকে কেন নেব? কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

অর্থ : আমি তো বণ্টনকারী, দিবেন তো আল্লাহ তা'আলা। (সহীহ বুখারী, হা.নং ৭১)

আল্লাহ থেকে নিয়ে বান্দাকে দেয়ার সিফত নিজের মধ্যে আনতে হবে। তাকওয়ার রাস্তা এখতিয়ার (অবলম্বন) করতে হবে।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

অর্থ : যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোন পথ তৈরি করে দিবেন। এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। (সূরা তালাক-২, ৩)

এ ইলম দ্বারা তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল হাসিল হলে মাখলুক থেকে মুস্তাগনী (অমুখাপেক্ষী) হবে। ইলমওয়ালা তখন আল্লাহ থেকে নিবে আর মাখলুককে দিবে।

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থ : এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। (সূরা জুমু'আ-৪)

হযরত মিকদাদ রা.-এর ঘটনা। একবার তার যিন্দেগিতে ফাক্বা (অভাব-অনটন) দেখা দিল। এমতাবস্থায় একদিন তিনি ইস্তিন্জা করতে বসলেন। সামনের গর্ত থেকে একটি ইঁদুর বেরিয়ে এল। ইঁদুরের মুখে সোনার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। ইঁদুরটি তার সামনে দীনারটি রেখে আবার গর্তে ঢুকে গেল। একটু পর বের হয়ে আরেকটি দীনার রেখে গেল। এভাবে সতেরো বারে ১৭টি দীনার নিয়ে এল। সর্বশেষ খালি থলেটিও সে নিয়ে আসল, যেন তার কাছে যে আর কিছু নেই এটা তার প্রমাণ। তিনি দীনারগুলো তুলে নিলেন। কিন্তু ঘরে নিলেন না। এমনিতে সব সাহাবীই মুত্তাকী ছিলেন, তবে তিনি ছিলেন প্রথম সারির। লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে নিয়ে যাবেন, কেউ যেন না দেখে? না, তিনি তা করেননি। বরং দীনারগুলো তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে পুরো বৃত্তান্ত শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা তার জন্য হালাল, না হারাম? তাকওয়াওয়ালা ছিলেন, তাই মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন। নবীজী জবাব দিলেন, এগুলো তোমার জন্য হালাল। তো দেখেন, ইঁদুরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন অথচ ইঁদুরের স্বভাব হল নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা নয়।

এ ইলমের বরিয়ায় তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল আসবে। না লোকের কাছে চাইব, আর না তাদের দিকে (লালচি দৃষ্টিতে) তাকাব। নাস্তা'ঈনু বিল্লাহ। (আমরা আল্লাহরই কাছে সাহায্য চাই)। মাখলুক নাফা দিতে পারে না। নাফা তো আল্লাহই দেন– কখনও মাখলুকের মাধ্যমে, আর কখনও মাখলুকের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি।

আল্লাহ তা'আলার দেয়ার তরীকা দু'টি–
(১) আসবাব দ্বারা, (২) আসবাব ছাড়া।

আল্লাহ তা'আলা যে বনী ইসরাঈলকে ৪০ বছর আসমানী খানা মান্না-সালওয়া দিলেন, এটা কি আসবাব দ্বারা? হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম কি আসবাব দ্বারা? মারইয়াম আলাইহিস সালাম যে আবদ্ধ ঘরে বে-মৌসুমী ফল পেয়েছেন, তাজা তাজা ফলমূল সেটা কি আসবাব দ্বারা?

قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ : হযরত যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, ওহে মারইয়াম! তোমার কাছে এ সব (বে-মৌসুমী ফল-মূল) কোথা হতে আসে? মারইয়াম বললেন, আল্লাহর নিকট হতে। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন। (সূরা আলে ইমরান-৩৭)

অনুরূপভাবে সাহাবী হযরত খুবাইব রা. ফল খাচ্ছেন; বন্দী অবস্থায় তাঁর হাতে আঙ্গুরের থোকা! কোত্থেকে এসেছে, আসবাব দ্বারা?

অতএব এ ইলম হাসিল করতে হবে তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল দ্বারা। ইবাদত, তাওহীদ ও কবুলিয়তের দিকে ঝুঁকে এ ইলম হাসিল করলে তাকওয়া-তাওয়াক্কুল পয়দা হবে। এমন তালিবে ইলম দু'আ ওয়ালা হবে। দাওয়াত ও দু'আ উভয়টির মাদ্দা (মূলঅক্ষর) এক– و — ع — د । লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকা হল দাওয়াত। আর আল্লাহকে লোকদের দিকে ডাকা হল দু'আ। আয় আল্লাহ! রহম কর, আয় আল্লাহ! ফযল কর, আয় আল্লাহ! মাফ কর।

দু'আ কী? দু'আ হল, আল্লাহকে মুতাওজ্জেহ করা, আল্লাহর মনোযোগ আকর্ষণ করা। দাওয়াত কায়েম হলে দু'আও কায়েম হবে। দাওয়াত ছুটে গেলে দু'আও ছুটে যাবে। দাওয়াত দিতে থাকলে ইলম যিকির, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত সর্বত্র দীন আসবে। খানা-পিনা, কাপড় পরিধান, বিবাহ-শাদী –সব কিছুতে দীন আসবে; এখন এসব ইয়াহুদী নাসারার তরীকায় হচ্ছে। কামাই রোজগারে দীন আসবে; এখন অন্যায়, মিথ্যা, ঘুষ, সুদ ও গলদ তরীকায় কামাই করছে।

পক্ষান্তরে দাওয়াত ছাড়লে মসজিদের দীনও মিটবে। *জিস্ তাজের নে মসজিদ বানা দিয়া বরস্ মেঁ নামাযী নেহী বন সাকা?* যে লোকটি মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে তার নামায দেখ? সে কি নামায পড়ে? পড়লেও কিভাবে পড়ে? সে কি কখনও মসজিদ ঝাড়ু দেয়? তার কাছে তো ইমাম হওয়া অপমানকর কাজ, মুআজ্জিন হওয়া অপমানকর কাজ, ঝাড়ু দেয়া-খেদমত করা অপমানকর কাজ– তো কবুল হবে তার মসজিদ? আর বানিয়েছে কোত্থেকে? সুদী সম্পদ থেকে। তাকওয়া-তাওয়াক্কুল হাসিল হলে এমন লোকের দ্বারা মসজিদ বানানো লাগবে না। ইমাম সাহেবের ১০ মিনিট দেরি হলে বলবে, নাহ্ একে দিয়ে কাজ হবে না, সরিয়ে দিতে হবে। একরাম নেই, আদব নেই। ইমাম সাহেবকে যেন নিজের গোলাম বানিয়েছে! আসলে যার ধন-সম্পদ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করা হয়, সে তো মাথায় উঠবেই।

না, এসব লোকের মুখাপেক্ষী হয়ে নয়, আল্লাহর জন্য যলীল (অপদস্থ) হও, তাঁর হুকুমের জন্য যলীল হও; নবীর জন্য যলীল হও, নবীর সুন্নাতের জন্য যলীল হও; দাওয়াতের জন্য যলীল হও, দীন ফায়লানোর জন্য যলীল হও।

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ

অর্থ : হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি. বলেন, হে লোকসকল তোমরা বিনয়ী হও, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহর জন্য নিচা হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে উঁচা করেন। (আল মু'জামুল আওসাত, লিত-তাবারানী, হা.নং ৮৩০৭)

দীনের ক্ষেত্রে নিয়ম হল আগে যিল্লত পরে ইজ্জত। আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হল আগে ইজ্জত পরে যিল্লত।

নবীর একেকটি সুন্নাত সারা দুনিয়ার চেয়ে দামী।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

অর্থ : হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমার সুন্নাত জিন্দা করল, সে আমাকে মহব্বত করল, আর যে আমাকে মহব্বত করল, সে আমার সাথে বেহেশতে থাকবে। (আল মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানী, হা.নং ৯৪৩৪)

ইলম আদব দ্বারা আসে। (১) উস্তাদের আদব, (২) মাদরাসার আদব, (৩) কিতাবের আদব, (৪) সময়ের আদব।

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

অর্থ : আল্লাহর সামনে আদবের সাথে অনুগত হয়ে দাঁড়াও। (সূরা বাক্বারা-২৩৮)

নামায আদবের সাথে পড়া। আমরা তো আদবের সাথে তাকবীরও বলতে পারি না। আমি আল্লাহর সামনে ঝুঁকেছি, যতক্ষণ এই ধ্যান না আসে রুকু থেকে মাথা উঠাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে রুকু করতে বলেছেন–

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا،

অর্থ : অতঃপর রুকু কর, রুকুতে শান্ত-স্থির থাক। (সহীহ বুখারী, হা.নং ৭৫৭)

ইতমিনান বা স্থিরতা কাকে বলে? অন্তরে আল্লাহর আযমত এমনভাবে ছেয়ে যাবে যে, নামায সাতআসমান পার হয়ে যায়।

কুরআন আদবের সাথে তিলাওয়াত করি। শুধু ইলম অর্জনের নিয়তে না পড়ি। হেদায়াতের নিয়তে পড়ি। ইলম তো তাবে (অনুগামী)। হেদায়াত আসলে ইলম আসবে। ইলম হেদায়াতকে খিঁচে না (আকর্ষণ করে না)। হেদায়াতই ইলমকে খিঁচে। হেদায়াত আমলকেও খিঁচে। ইলম আমলকেও খিঁচে না।

ইলম হেদায়াতের নিয়তে শেখা। আজ হেদায়াতের আগ্রহ নেই। আমাদের আগ্রহ হল মুহাদ্দিস হব, মুফাসসির হব। এতে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতী হয়তো হব কিন্তু হেদায়াত না-ও আসতে পারে। হেদায়াত আসলে জাহালাত পালাবে, তাওয়াযু আসবে। এককথায় তামাম সিফাত আসবে। তাবলীগী জামাত এ উলূম শিখতে ও ধারণ করতেই জামাতে বের হয়। (অতঃপর তাশকিল করা হয়। তাশকীলের পর বলেন, এটুকু যথেষ্ট নয়) আরও তৈরি করবেন, তবে আখলাক দ্বারা, শক্তি দ্বারা নয়।

*(বি.দ্র. আয়াত ও হাদীসসমূহের ইবারত, অনুবাদ এবং হাওয়ালা বয়ানলেখকের মেঝো সাহেবযাদা [ফাযেলে রাহমানিয়া] মুফতী আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম কর্তৃক সংযোজিত)*

## আ ত্ম জী ব নী

*দারুল উলূম করাচির মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা এখন থেকে ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করবে। অনুবাদ করেছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী, দারুল উলূম করাচির ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত* ***মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী।***

# ইয়াদেঁ

## শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

**(চতুর্থ পর্ব)**

এই ছিলো আমার আট ভাই-বোনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। আমি হলাম তাঁদের সবার ছোট। পূর্বে যেমনটা বলে এসেছি– আমার জন্ম ৫ই শাওয়াল ১৩৬২ হিজরী সনে। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর ইন্তিকাল আমার জন্মের প্রায় তিন মাস পূর্বে হয়েছিলো। তাই আমি ছাড়া আমার অন্যান্য ভাই-বোনদের এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে যে, তারা হযরতের যিয়ারত লাভে ধন্য হয়েছেন, অথবা অন্তত হযরতের মুবারক নযর তাদের উপর পড়েছিলো। আর আমি উভয় সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলাম! তাছাড়া আমার সব ভাই-বোনের নামও হযরত নিজে রেখেছেন। যদিও আমার নাম সরাসরি হযরতের পক্ষ থেকে রাখার প্রশ্ন ছিলো না, তথাপি আব্বাজান যখন আমার কোন বড় ভাইয়ের নামের জন্য হযরতের খেদমতে দরখাস্ত পেশ করতেন, তখন হযরত থানবী রহ. আগে রাখা ভাইদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে একত্রে কয়েকটি নাম বলে দিতেন যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নির্বাচন করা যেতে পারে। সে তালিকায় 'মুহাম্মাদ তাকী' নামটিও ছিলো। আর এ নামে আমার পূর্বে অন্য কোন ভাইয়ের নাম রাখা হয়নি। খুবসম্ভব আব্বাজান আমার নাম সেই তালিকা থেকেই নির্বাচন করেছেন। হযরত থানবী রহ.-এর ইন্তিকালের পর আব্বাজান যেহেতু বেশিরভাগ কাজ তাঁর প্রিয় উস্তায ও মুরুব্বী হযরত মিয়াঁ সাহেব রহ. (হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসগর হুসাইন দেওবন্দী)-এর মাশওয়ারায় করতেন, খুবসম্ভব আমার নাম রাখার ক্ষেত্রে আব্বাজান তাঁর মাশওয়ারাও নিয়েছেন। মিয়াঁ সাহেব রহ. কাশফ ও কারামাতওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন।

আমার বড় তিন ভাই দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশোনা করতেন। আমি তো তখনো কায়দায়ে বোগদাদীও পড়া শুরু করিনি। তাই দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ার প্রশ্নই বা কী ছিলো! তবে কখনো কখনো বড় ভাইদের সঙ্গে দারুল উলূমে চলে যেতাম। তাই সে সময়ের দারুল উলূমের ঝাপসা স্মৃতি আমার মনের ক্যানভাসে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

**শিশুকাল ও মায়ের কোল বসন্তের মতোই মনোমুগ্ধকর!**

আমাদের ঘরের পেছনের দিকে অর্থাৎ পশ্চিমাংশে আমাদের দাদা হযরত মাওলানা ইয়াসিন রহ.-এর ঘর ছিলো। আমাদের দাদী রহ. যিনি হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর হাতে বাইআত ছিলেন, তিনিও সেই ঘরে থাকতেন। আমাদের আর তার ঘরের মাঝ দিয়ে সুরঙ্গের মত একটি পথ ছিলো। আমরা সেটাকে 'নীমদারি' বলতাম। দাদার ঘরের আশেপাশে আমাদের বংশের অন্যান্যদের ঘর ছিল। ঘরের পাশ ঘেঁষে একটি সরু পথ গিয়ে মিলেছে 'চক' নামক এলাকায়। 'চকের মাঠ' আমাদের ছোটদের খেলাধুলোর জন্য বেশ প্রসিদ্ধ ছিলো। তখনকার কল্পনায় সেটি আমাদের জন্য একটি বৃহৎ স্টেডিয়ামের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। পাড়া-মহল্লার ছেলেপুলেরা সব এখানেই খেলতে আসতো। সেখানে খেলাধুলোর জন্য না টাকা-পয়সার প্রয়োজন হতো, না অভিজ্ঞ কোচের কাছে অনুশীলন করতে হতো। আমাদের বড় ভাইও অনেক সময় আসরের পর সেখানে গিয়ে বিভিন্নরকম দেশীয় খেলা খেলতেন। আজ যদ্দুর মনে পড়ে, তিন-চার বছরের এক ছোট্ট শিশুর বিশালাকারের এই ভুবন, ঘর থেকে শুরু হয়ে সেই চকে গিয়ে মিশে যেতো। সেখানে আমি নিজে খেলার চেয়ে অন্যদের খেলা দেখেই বেশি আনন্দ উপভোগ করতাম।

যেমনটা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, তিন ভাতিজী এবং এক ভাতিজা বয়সে আমার চেয়ে এক থেকে তিন বছরের বড় ছিলো। তাই আমার জন্য নিজেদের বাইরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধব তালাশ করার প্রয়োজন হতো না। এই ভাতিজা-ভাতিজীদের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। ছোট্টবেলায় আমার খেলাধুলোর সাথী বলতে তারাই ছিলো। সে যুগে আমাদের ছোটদের খেলাধুলা বলতে ছিলো, কানামাছি ইত্যাদি। আর এর জন্য আমাদের ঘরই যথেষ্ট ছিলো। বাইরে 'চক স্টেডিয়ামে' যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। ডাঙ্গুলি আমাদের সাধ্যের বাইরের খেলা ছিলো। তাছাড়া এমনিতেও আমি কোন খেলাতেই উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করতে পারিনি।

আমি আমার নয় ভাই-বোনের সবার ছোট। সম্ভবত এজন্যই সবার আহ্লাদী ছিলাম। জানা নেই, এটা সবার আহ্লাদের কারিশমা, না-কি সত্যিই এ বিষয়টির কোন সত্যতাও আছে যে, আব্বা-আম্মা থেকে শুরু করে ভাই-বোন সবাই আমার অতটুকুন বয়স থেকেই আমার ধী-শক্তির গুণগ্রাহী ছিলেন। আর তাঁদের এ দাবির পক্ষে আমার যে সকল ঘটনাবলি উপস্থাপন করা হয়, সেগুলো আজও আমার মনে এভাবে গেঁথে আছে, যেনো তা আজকেরই ঘটনা! সেগুলো থেকে কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করছি, হয়তো আপনিও আনন্দ পাবেন–

**এক.** আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. (আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রহমতের বারি বর্ষণ করুন!) যদিও তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুফতী ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলম ও ফযলের এমন সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, যার খ্যাতি দেশজুড়েই ছিলো এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ শিষ্যরা প্রিয় উস্তাযের প্রতিটি খেদমতকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের সোপান মনে করতো তথাপি আব্বাজানের মেযাজ এতোটাই নিরহংকার ও সরল ছিলো যে, ঘরের বাজার-সদাইসহ যাবতীয় কাজের জন্য তিনি নিজেই বাজারে চলে যেতেন। কখনো কখনো ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি নিজের কোঁচড়ে ভরে নিয়ে আসতেন। তখন আমি এতটুকু বড় হয়ে গিয়েছিলাম যে, আব্বাজানের সঙ্গে তার আঙ্গুল ধরে ধরে বাজারে যেতে পারি। আব্বাজানের সঙ্গে বাজারে গেলে ফেরার পথে তিনি আমাকেও পছন্দমত কিছু না কিছু কিনে দিতেন। তখনো চকলেট-টফির যুগ শুরু

হয়নি, তাই আমাদের পছন্দই বা কি ছিলো! সামান্য ছোলাভাজা, ভুট্টাভাজা, মুড়ির মোয়া, বরফ মালাই (এটি আইসক্রিমের একটি দেশীয় পদ) এবং দেশীয় মিঠাই ইত্যাদি আর কি! যুগের কিছুটা উন্নতি হলে এক পয়সায় চকলেটের মতো ছোট্ট মিঠাই পাওয়া যেতে শুরু করলো। আকৃতিতে সেটা কমলালেবুর কোয়ার মতো হতো। আমরা এটাকে 'সাঙতারে কি মিঠাই' বলতাম। এখন মনে হচ্ছে, সে যামানায় বাচ্চাদের চাহিদা বেশিরভাগ এমন কিছুর প্রতি থাকতো, যেগুলো ছিল স্বাস্থ্যকর এবং সস্তায় সহজলভ্য। বাচ্চাদের খুশি করার জন্য আজকালের মতো অস্বাস্থ্যকর এবং দামী জিনিসপত্রের কল্পনাও তখন ছিলো না। যাই হোক! আব্বাজান যখন আমাদের সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে যেতেন, উল্লিখিত জিনিসের কোন একটি অবশ্যই কিনে দিতেন। ফলে আমাদের আসা-যাওয়ার কষ্ট স্বার্থক হয়ে যেতো।

তবে বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্য আদৌ এসব ছিলো না। আমাদেরকে কিছু কিনে দেয়া একান্তই আব্বাজানের ইচ্ছাধীন ছিলো। সন্তানদের তরফ থেকে কিছু কিনে দেয়ার আবদার করা, বা বায়না ধরার প্রচলন তখনো শুরু হয়নি।

একবার হলো কি! আব্বাজান বাজার থেকে আলু কিনে ঘরে ফিরছিলেন। আমিও আঙ্গুল ধরে ধরে তাঁর সঙ্গে চলছিলাম। ঘটনাক্রমে সেদিন তিনি বাজার থেকে আমাকে কিছু কিনে দেয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। এদিকে আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে যে, আমার জন্যও তো কিছু চাই! কিন্তু যখন পাচ্ছিলাম না, অপরদিকে আব্বাজানও বাজার পেরিয়ে বাসার গলির দিকে মোড় নিচ্ছিলেন, যার পরে এমন কোন দোকানও নেই যেখানে আমাদের পছন্দসই কিছু পাওয়া যাবে! বুঝতে পারলাম, এখন আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। এদিকে যেমনটা পূর্বে বলেছিলাম যে, নিজের থেকে কিছুর আদেশ-আবদার করা তখনকার রেওয়াজ এবং স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো। অপরদিক আব্বাজানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও মন চাচ্ছিলো যে, আপনি কিছু ভুলে যাননি তো! তখন আমার কচিমন এই দুটো বিপরীত বিষয়ের সমাধান এভাবে বের করলো যে, আমি আব্বাজানকে বললাম– 'আব্বাজি! আজ না হয় আমার হাতে আলুই ঢেলে দিন!'

আব্বাজান আমার মুখে এমন কথা শুনে অনিচ্ছাকৃত হেসে দিলেন এবং আলুর পরিবর্তে আমার পছন্দনীয় কিছু কিনে দিয়ে ঘরে ফিরলেন। বাসায় ফিরে তিনি সবাইকে আমার এই ঘটনা শোনালেন। পরবর্তীতে এটি একটি কৌতুক বনে গেলো।

**দুই.** দেওবন্দে প্রতি বুধবার হাট বসতো। সেখানে অত্র অঞ্চলের মানুষ নিত্যব্যবহার্য আসবাবপত্র বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসতেন। সে হাটে সাধারণত ঘরোয়া জিনিসপাতি সস্তায় ক্রয়-বিক্রয় হতো। সবাই এটাকে 'বুধবাজার' বলতো। আব্বাজান একবার বুধবাজারে যাওয়ার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। এখন মনে নেই তিনি বাজার থেকে কী কিনেছিলেন, তবে বাজারটি গৃহস্থালি আসবাবপত্রের জন্য খ্যাত ছিলো এবং সেখানে ছোটদের চাহিদা মাফিক বিশেষ কিছু পাওয়া যেতো না। তাই সেদিনও তিনি আমাকে কিছু কিনে দেননি। কেনাকাটা শেষে এবার ঘরে ফেরার পালা। আমরা বাজারের সর্বশেষ দোকানের কাছে পৌঁছে গেলাম। দোকানে চিনির তৈরী বাতাসার ঢের লাগিয়ে রাখা ছিলো। বাতাসার দোকানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার কালে আমি নিজেকে আর সংবরণ করতে পারিনি। আব্বাজানকে বললাম– 'আব্বাজি! অন্তত বাতাসার দামটাই জিজ্ঞেস করে নিন না!' এভাবেই আমি আব্বাজানের ভুলে যাওয়া 'দায়িত্ব' মনে করিয়ে দিতাম।

**তিন.** দেওবন্দে আমাদের মহল্লাকে সবাই 'বড় ভাইয়ের মহল্লা' নামেই চিনতো। মূলত আমাদের পূর্বপুরুষরা 'বড়ভাই' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের নামেই এই মহল্লার প্রসিদ্ধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের ঘরের পূর্বপাশে, মূল ফটকের পাশঘেঁষে একটি ছোট্ট সড়ক ছিলো। সড়কটি মুসলিম বসতিকে হিন্দু বসতি থেকে পৃথক করে রেখেছিলো। আমাদের ঘর বরাবর এই সড়কের অপর পাশে বেশিরভাগই ছিলো হিন্দু বসতি। তবে মুসলিম-হিন্দু প্রতিবেশীদের পারস্পরিক বন্ধন ছিলো চমৎকার। আমাদের ঘরের সামনে সেই সড়কেই একটি আটার কারখানা ছিলো। আমরা সেটাকে 'আনজান' বলতাম। মনে পড়ছে, একবার সেই কারখানায় আগুন লেগে গিয়েছিলো। তখন সর্বপ্রথম আমার আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. তাদের সাহায্যকারী হয়ে হাজির হয়েছিলেন। দীর্ঘসময় ধরে তিনি পানি ছিটিয়ে এবং মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করে আগুন নেভানোর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। অমুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণ আমাদের সকল মনীষীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। আব্বাজানের কাজের এই চমকপ্রদ দৃশ্য আমার জন্য ছিলো হৃদয়জুড়ানো এবং চিত্তাকর্ষক। আমি ঘরে বসে সে দৃশ্য দেখার পর থেকে ভাই-বোনদের সামনে আমার আধোআধো বোলে সেটা বয়ান করে শোনাতাম এবং হাত-পায়ের সাহায্যে তা প্রদর্শনী করে দেখাবার চেষ্টা করতাম। প্রদর্শনী করতে গিয়ে কখনো ভাই-বোনদের গায়ে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, যেমনটা আগুন নেভাতে আসা লোকদের আনজান কারখানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিলাম। আমার ভাই-বোনেরা প্রায়ই আবদার করে আমার থেকে এই প্রদর্শনী দেখতে চাইতো।

প্রায় ছয় বছর পর্যন্ত আমি কথায় জড়তাগ্রস্ত ছিলাম। এটা নিয়েও রকমারি মজার মজার ঘটনাপঞ্জি আমাদের পরিবারের সবার মুখে প্রচলিত।

হযরতুল আল্লাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর বড় সাহেবযাদা মাওলানা আযহার শাহ কায়সার রহ. (সাবেক সম্পাদক, মাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ) আমাদের বড়ভাই জনাব মুহাম্মদ যাকী কাইফী রহ.-এর একান্ত বন্ধু ছিলেন। সে সূত্রে আমাদের ঘরে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিলো। তিনি আমাকে অনেক বেশি মহব্বত করতেন। ঘরের সবাই আমাকে আদর করে তাকী'র পরিবর্তে 'তাকু' বলতেন। মাওলানা আযহার সাহেবও আমাকে এই নামে ডাকতেন এবং অধিকাংশ সময় আমাকে কোলে নিয়ে 'তাকু, তাকু' বলে খুনসুটি করতেন। অপরদিকে তাঁর নাম তো ছিলো আযহার। কিন্তু আমি বিকৃতভাবে, জড়তাগ্রস্ত মুখে বলতাম– 'আজহাল'!!! সুতরাং যখনই তিনি আমাদের দরজায় কড়া নাড়তেন এবং বাইরে এসে আমি তাকে দেখতে পেতাম, অমনি দৌড়ে গিয়ে ভাইজানকে বলতাম– 'ভাই! আজহাল আয়ে হ্যাঁয়' ভাইজান! আজহাল এসেছে। মাওলানা আজহার সাহেবও আমার এভাবে বলাটা খুব করে উপভোগ করতেন।

পাকিস্তান আসার পর যখন আমার তত্ত্বাবধানে 'মাহনামা আল-বালাগ' প্রকাশ পেতে শুরু করলো এবং তার প্রথম সংখ্যা মাওলানার হাতে পৌঁছলো, তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখলেন। দীর্ঘ অনেক বছর পর এটাই ছিলো আমার প্রতি তার প্রথম চিঠি। তিনি লিখেছেন– 'এখন তো আপনি মাওলানা তাকী উসমানী বনে গেছেন। তবে আমার

কাছে কিন্তু এখনো সেই 'তাকু মিয়া'ই রয়ে গেছেন, যে কিনা আমাকে আজহাল বলে সম্বোধন করতো!'

চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন–

'–আপনার সেই আজহাল ভাই।'

আমাদের ঘরে কাব্য ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিলো। হযরত আব্বাজানের শের বা কবিতাসমগ্র তো তার 'কাশকোল' নামক গ্রন্থে ইতোমধ্যেই ছেপে গেছে। বড় ভাইজান মাওলানা মুহাম্মদ যাকী কাইফী রহ.-ও মশহুর কবি ছিলেন। আমার বড় দু'বোন যদিও নিয়মতান্ত্রিক কোন মাদরাসা বা স্কুলে পড়াশোনা করেননি এবং তাদের পড়াশোনার পরিধি ঘরোয়া শিক্ষা-দীক্ষা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো, তথাপি কবিতা ও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাদের এক নির্দোষ অনুরাগ ছিল। কখনো কখনো তারা নিজেরাও শের-কবিতা আবৃতি করতেন। এই পরিবেশের ফল এই ছিল যে, সেই বাল্যকালে, জীবনের শুরুর দিকেই অনেক কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। আমি আমার আধোআধো বোলে সেগুলো আবৃতি করতাম। ঘরের অন্যান্যরা আমার জড়তাগ্রস্ত মুখের শের শুনে যারপরনাই আনন্দ উপভোগ করতেন।

এটা সে সময়ের কথা যখন হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত চরম আকার ধারণ করেছিলো। সেই সংঘাত ও রক্তপাতের সকরুণ চিত্র জনৈক কবি বড় মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছিলেন! তার কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি তখন থেকেই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো।

کیا کیا ہوا موجودہ حکومت کے سہارے!
گنگا کے کنارے!
گھر جلتے تھے، اڑتے تھے ہواؤں میں شرارے!
گنگا کے کنارے!
بوسے جنہیں ماں باپ دیا کرتے تھے سو بار
کرتے تھے جنہیں پیار!
کفار نے نیزے انہی رخساروں پہ مارے!
گنگا کے کنارے!

অনুবাদ-

এই হুকুমত-ছত্রছায়ায়
জুলুম যেন মুড়কি!
ঐ গঙ্গার পাড়ে!
জ্বলছে আগুন বাস্তুভিটায়,
উড়ছে হাওয়ায় ফুলকি!
ঐ গঙ্গার পাড়ে!
বাপ-মা যাদের হাজার চুমোয়,
গাল ভেজাতো সোহাগ-মায়ায়,
সেই মুখেতে জালিম-রাজা
ছুড়ছে তীর ও সড়কি!
ঐ গঙ্গার পাড়ে!

আমাদের ছোট আপা মুহতারামা রাকিবা খাতুন। আল্লাহর মেহেরবানী, তিনি এখনও হায়াতে আছেন। ছোট আপা একবার আমাকে (গত সংখ্যায়) উল্লিখিত কবিতাটি চমৎকার সুরে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ছোটবেলায় কবিতাটি আমার এমনই মনে ধরেছিলো, যতক্ষণ না এটি তার মুখে শুনতাম, ঘুমাতাম না। সুতরাং তিনি এটি দিয়ে আমার 'ঘুমপাড়ানি গীত'-এর কাজ নিতেন। আর পরবর্তীকালে আমি তাকে সম্বোধন করে নিম্নের এই কবিতাটি আবৃত্তি করতাম। কবিতার প্রথম শ্লোক দু'টি এই–

چھوٹی آپا! مری اس نظم کا عنواں تم ہو
تم ہو اس بزم کی تزیین کا ساماں تم ہو
ছোট আপা! মোর কবিতার শিরোনামা তুমি/
এই আসরের সকল শোভার কারিগরও তুমি।

(শেষের পঙ্ক্তিতে আছে সেই ঘুমপাড়ানি গীতের ইঙ্গিত)

لوریوں میں بھی مجھے درس دیئے ہیں تم نے
ہاں مری بہن، مری دوست، مری ماں تم ہو
ঘুমপাড়ানি গীত গেয়েও শিক্ষা দিতে তুমি/
বোন আমার, বন্ধু আমার, মা-ও আমার তুমি।

এছাড়াও পাড়া-মহল্লাজুড়ে তখন পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন ও শ্লোগানে পথঘাট মুখরিত ছিলো। কবি, সাহিত্যিকগণও স্বাধীনতাকামীদেরকে কবিতার মাধ্যমে সাহসের রসদ যোগাতেন। কোত্থেকে যেনো আমি সেগুলো শুনেশুনে আমার আধোআধো বোলে, বিকৃতভাবে রিহার্সাল শুরু করে দিতাম। মাওলানা আমের উসমানী রহ.-এর এই শ্লোক সে সময়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলো।

یا رنج بلا کا خوف نہ کر،
یا نام نہ لے آزادی کا
گر دار ورسن کی تاب نہیں،
الزام نہ لے آزادی کا
হয় ভুলো দুঃখ-ব্যথা, বেদনার ভয়/
নয় মুখে এনো না আযাদির নাম!
নেই যদি হিম্মত ফাঁসিতে ঝোলার /
ছড়িয়ো না আযাদির নামে বদনাম।

এবং তারই রচিত আরেকটি শ্লোক–

اگر لینی ہے آزادی تو مسلم لیگ میں آؤ
اخوت کا علم لے کر جہان کفر پر چھاؤ
স্বাধীনতা যদি পেতে চাও
তবে মুসলিম লীগে ভিড়ো/
ভাই-ভাই হয়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে,
কুফরের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

আমি ছোট্টবয়সে সেই ছড়া-কবিতা না বুঝেই বিকৃতভাবে আবৃত্তি করতাম। আর ঘরের সবাই শুনে অনেক মজা অনুভব করতেন। এটা সে যুগের কথা, যখন গোটা হিন্দুস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব যুবশ্রেণীর কাঁধে ছিলো এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জোরদাবী উঠছিলো। সুতরাং আমাদের ঘরের পূর্বপাশের সেই ছোট্ট সড়কটি মিটিং-মিছিলের মুহুর্মুহু শ্লোগানে মুখরিত থাকতো। মিছিলকারীরা অধিকাংশই কারো না কারো জন্য 'জিন্দাবাদ' শ্লোগান তুলতো। আমি দূর থেকে যখন কোন মিছিলের হই-হুল্লোড় শুনতে পেতাম, আমার জড়তাগ্রস্ত মুখে ঘরের সবাইকে বলতাম-

جندہ باد آلہے ہیں
(জিন্দাবাদ আ-লাহে হ্যাঁয়।)
(زندہ باد آ رہے ہیں)
(শুদ্ধ উচ্চারণ : যিন্দাবাদ আ-রাহে হ্যাঁয়।) 'যিন্দাবাদ আসছে।'

এছাড়াও মিছিলের বিভিন্ন শ্লোগান শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। যেমন–

سینے پے گولی کھائیں گے.
پاکستان بنائیں گے.
বুক পেতে গুলি খাবো
পাকিস্তান গড়ে নেবো।

আমি যখন আধোআধো বোলে শ্লোগান রিহার্সাল করতাম, ঘরের সবাই পরম বিনোদিত হতেন।

**ফুফু উম্মাতুল হান্নানের ঘরোয়া মকতব**

আমরা যে মহল্লায় থাকতাম, সেখানে চকের (চক মহল্লা সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে) সন্নিকটে আমাদের বংশের এক বুযুর্গ মহিলা ছিলেন। তার নাম ছিলো উম্মাতুল হান্নান। আমরা সবাই তাকে ফুফু বলতাম। কারণ তিনি আমাদের আব্বাজানের বংশীয় বোন ছিলেন। আহা! তার ঘরের আলোক-রোশনাই কতই না চমকপ্রদ ছিলো! আমাদের পুরো খান্দানের বরং যুগযুগ ধরে শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো এটি। এখানে পরম্পরাক্রমে আমাদের কয়েক প্রজন্ম তার থেকে তালিম হাসিল করেছেন। কুরআনে কারীমের নাযেরা শিক্ষাদানের জন্য খ্যাত হলেও, তিনি কুরআনে কারীমের পাশাপাশি বেহেশতী যেওর ইত্যাদিও পড়িয়ে দিতেন। এর ফলে বিয়ের পর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল জরুরী মাসাইল শিক্ষার্থীদের জানা হয়ে যেতো। তিনি গতানুগতিকভাবে পড়িয়েই ক্ষান্ত দিতেন না, আমলেরও তারবিয়ত করতেন। এই শিক্ষা ও দীক্ষা কার্যক্রমই

ছিলো তার মূল ব্যস্ততা এবং এটাই ছিলো তার প্রিয়তম শখ। এর মাধ্যমে তিনি শতশত শিশুকে সত্যিকার মানুষ বানিয়েছেন। আমাদের সবার বড় বোন থেকে নিয়ে আমি পর্যন্ত সবাই তার শিষ্য ছিলাম।

বয়সস্বল্পতার দরুন আমি তখনো ফুফুর পাঠশালায় নিয়মতান্ত্রিক ছাত্রত্ব লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠিনি। তবুও আমার আব্বা-আম্মা আমাকে কায়দায়ে বোগদাদী হাতে ফুফুর ওখানে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবেই আমি তাঁর ঘরোয়া মকতবে কায়েদায়ে বোগদাদী পড়া শুরু করি। সেখানে তিনি অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহের সাথে শিক্ষা ও তরবিয়তের কাজ আঞ্জাম দিতেন।

শৈশবের এ কথাগুলোই এখন আমার মনে আছে। এছাড়াও আরো অনেক বিষয়াদি রয়েছে, সেগুলোর প্রতি পাঠকবৃন্দ আগ্রহী না-ও হতে পারেন বা সেগুলো তাদের উপকারে না-ও আসতে পারে।

তখন আমার বয়সই বা কতো ছিলো! তবে নিশ্চিতভাবে বলতে না পারলেও অবশ্যই সাড়ে চার বছরের কম ছিলো। কারণ আমার বয়স পাঁচ পূর্ণ হওয়ার আগেই আমরা দেওবন্দ থেকে পাকিস্তানে হিজরতের জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলাম। তবে আমাদের বড়ভাই জনাব মুহাম্মদ যাকী কাইফী রহ.-এর বিবাহ ১৯৪৬ ইংরেজি সনে হয়েছিলো, সেটা আমার মনে আছে। আর তখন আমার বয়স নিশ্চিতভাবে তিন বছর ছিলো। সুতরাং যে বিষয়গুলো আমার দিলে এখনো গেঁথে আছে, সেগুলো আমার তিন থেকে সাড়ে চার বছর বয়সের স্মৃতি। আমি আশ্চর্যবোধ করি, সেই আমিই কিনা আজকাল মাঝেমধ্যে গতকালের কথাও মনে রাখতে পারি না! অথচ অত অল্প বয়সের এ সকল বিষয়াদি এমনভাবে আমার মনে গেঁথে আছে, যেন এখনোও সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এ থেকে আন্দায করা যায়, বাল্যকালে যা কিছু হৃদয়পটে বদ্ধমূল হয়, তা কতোটা সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয়। এ জন্যই বলা হয়, শিশুদের সামনে ভালো কথা বলো। কাজেই একথা মনে করার সুযোগ নেই যে, এই অবুঝ শিশুদের উপর আমাদের কথার কিইবা প্রভাব পড়বে এবং এসব তো ওদের বোধ-বুদ্ধির উর্ধ্বে!

তবে এটা আমার মাহরূমী এবং এই আক্ষেপ আমার সবসময় ছিলো যে, দেওবন্দ তখন বড় বড় উলামা, আউলিয়া কেরামের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। কিন্তু বয়সস্বল্পতার দরুন তাদের কারো যিয়ারতের কথা আমার মনে নেই। হ্যাঁ! একবার আব্বা-আম্মার সঙ্গে থানাভবন যাওয়ার কথা মনে আছে। যদ্দুর মনে পড়ে, সেটাই ছিলো আমার প্রথম রেলভ্রমণ। কিন্তু তখন এতটুকু অনুভূতি ছিলো না যে, থানাভবন আসলে কী এবং সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী? তবে হযরত থানবী রহ.-এর পর আব্বাজানের অত্যন্ত প্রিয় উস্তায এবং মুরুব্বী হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসগর হুসাইন সাহেব রহ. (যিনি মিয়াঁজী সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন) জীবিত ছিলেন। খুবসম্ভব আব্বাজান আমার তাহনীকও তাঁর মাধ্যমে করিয়েছেন। আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে, হযরতের যিয়ারতের কথাও আমার মনে নেই। তবে পরবর্তীকালে একবার স্বপ্নলোকে তার যিয়ারত লাভ করেছিলাম। যে অবয়বে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম ভাই-বোনদেরকে তার বিবরণ শোনালে তাদের চাক্ষুষ অবয়বের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল! তেমনিভাবে তখন শাইখুল ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী এবং শাইখুল আদব মাওলানা ই'যায আলী রহ. প্রমুখ আকাবিরও দেওবন্দে ছিলেন। কিন্তু বয়সস্বল্পতার দরুন আমি তাঁদের যিয়ারতও লাভ করতে পারিনি।

১৩৬৬ হিজরী সনের ২৭শে রমজানুল মুবারক মোতাবেক ১৯৪৭ ইংরেজি সনের ১৪ই আগস্ট জুম'আতুল বিদার বরকতময় রাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন আমার বয়স ছিলো আট দিন কম চার বছর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালাভের দিনে আমাদের বাসার সুরতহাল তো নির্দিষ্ট করে মনে নেই, তবে এতটুকু মনে আছে, আমাদের ঘরে তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা খুব বেশি আলোচনা হতো। এজন্য আমার শিশুসুলভ মনে এই কল্পনা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, পাকিস্তান হয়তো বড় কোন অট্টালিকা হবে। সেখানে অনেক বড় হলরুম থাকবে। হলরুমের দরজা-দেয়ালজুড়ে চাঁদ-তারা শোভা পাবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু-মুসলমান তুমুল দাঙ্গা বেঁধে গেলো। পূর্ব পাঞ্জাবে শিখ কর্তৃক মুসলমানদের উপর এক রক্তক্ষয়ী উপাখ্যানের সূচনা হলো। মুসলমানদের উপর নেমে আসলো জুলুম-নিপীড়নের ঘোর অন্ধকার। ইউপি জেলার অন্তর্গত দেওবন্দ এলাকাটি যেহেতু পূর্ব পাঞ্জাব সংলগ্ন ছিলো, তাই সেখানেও শিখদের একটি বড় অংশের বসতি ছিলো। শিখদের জুলুম-নিপীড়নের পরিধি আমাদের জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। হিন্দুরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। শিখদের মত তারাও বিদ্বেষ ও জিঘাংসাপূর্ণ শ্লোগান দিয়ে মিছিল বের করতো।

দেওবন্দে আমাদের মহল্লার পূর্বপাশ জুড়ে বিস্তৃত হিন্দু জনবসতি ছিলো। ওটাকে সবাই হিন্দুপাড়া বলতো। প্রতি রাতেই এই গুজব ছড়িয়ে পড়তো যে, আজ রাতে হিন্দু বা শিখ কর্তৃক মুসলমানদের উপর আক্রমণ হবে। এই আশঙ্কা থেকেই যুবকেরা মফস্বলের বিভিন্ন বিপদজনক পয়েন্টে পালাক্রমে পাহারা বসাতো। অবস্থাদৃষ্টে, বিশেষত শিখদের এহেন খুনোখুনির আলেখ্য আমার শিশুসুলভ স্মৃতিপটে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো। আমার চার বছর বয়সী কচি মনে একথা ঠাঁই করে নিয়েছিলো যে, শিখ কোন ভয়ংকর বিপদজনক প্রাণী হবে! একবার কী কারণে যেনো আমি বাসার সবার সঙ্গে অভিমান ও বয়কট করে রাতে আমাদের ঘরের পূর্বপাশের দরজার কোণঘেঁষে শুয়ে পড়েছিলাম। আমার সেই ছোট্ট সময়ের দৃষ্টিতে ঘরের এই কোণটি দুই কারণে বিপদজনক ছিলো। প্রথমত এখানে জ্বালানি, খড়কুটো পড়ে থাকতো, তাই কখনো এতে বিচ্ছুরও দেখা মিলতো। দ্বিতীয়ত এই দরজাটি হিন্দুপাড়া অভিমুখী ছিলো এবং এটার পাশ দিয়েই শিখদের মিছিল যেতো। আর এদিক দিয়ে শিখদের আক্রমণের আশঙ্কাও ছিলো সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই দু'টো বৃহৎ বিপদজনক আশঙ্কার কথা জেনেশুনেও আমি ঘরের সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাইতাম, তাদের কিছু আচরণ আমার কাছে এতোটাই অসহ্যকর যে, বাধ্য হয়েই আমাকে এমন কঠিন এবং ধ্বংসাত্মক প্রতিবাদের পথ বেছে নিতে হয়েছে। আমার ভাই-বোনেরা পালাক্রমে এসে যখন আমার অভিমান ভাঙিয়ে ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করছিলেন তখন আমার জড়তাগ্রস্ত মুখে শুধু একটিই জবাব ছিলো–

چاہے چھتھ آؤ، چاہے بچھو تاتو، ہم تو یہی لہیندے

(চাহে ছিথ আও, চাহে বিচ্ছু তাতো, হাম তো এহী লাহেনদে!)

چاہے کوئی سکھ آجاے، یا کوئی بچھو کاٹ لے،
ہم تو یہیں پڑے رہیں گے!

(শুদ্ধ উচ্চারণ: চাহে কোয়ি সিখ্ আ-জায়ে, ইয়া কোয়ি বিচ্ছু কা-ট লে, হাম তো এহী পড়ে রাহেঙ্গে!)

'শিখ আসুক আর বিচ্ছু কাটুক, আমি তো এখানেই পড়ে থাকবো।'

অবশেষে আমার এই কঠোর প্রতিবাদ ও অনশন ভাঙাতে সবাই যখন ব্যর্থ, তখন হযরত আব্বাজান রহ.-কে হস্তক্ষেপ করতে হলো। তিনি এসে আমাকে কোলে নিয়ে আদর করলেন এবং উঠিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। জানা কথা, এর পর থেকে আমার দাবী-আবদারগুলোও 'সসম্মানে' মেনে নেয়া হতো।

চলবে ইনশাআল্লাহ...

# চামড়া বাণিজ্যে স্বেচ্ছাচার : বিবেকের আদালতে কিছু প্রশ্ন

**মাওলানা ইরফান জিয়া**

চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা নাহ্লের আশিতম আয়াতে এই নেয়ামতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সারা বিশ্বেই চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রীর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। জুতা, ব্যাগ, বেল্ট ও জ্যাকেটসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক সামগ্রীতেই রয়েছে চামড়ার ব্যবহার।

২০১৫ সালের জানুয়ারীতে রাজধানী ঢাকায় 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য: তৈরি পোষাকের পরবর্তী সম্ভাবনাময় শিল্প' শীর্ষক কর্মশালার বক্তব্য অনুযায়ী সে সময়ে বিশ্বে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার ছিলো দুই শ' ত্রিশ কোটি মার্কিন ডলারের।[1] ২০১৮ সালের ৩ জুলাই কালের কণ্ঠের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে চামড়াজাত পণ্যের বাজার বাইশ হাজার কোটি ডলারের। এ দু'টো রিপোর্ট থেকেই সারাবিশ্বে এ ধরনের পণ্যের বিপুল চাহিদা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

শুধু বিশ্ববাজারেই নয়, বাংলাদেশেও রয়েছে চামড়াজাত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা। ট্যানারি ছাড়াও বাংলাদেশে প্রায় একশ' দশটি চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের কারখানা রয়েছে। বাংলাপিডিয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর দুইশ' থেকে দুইশ' পঞ্চাশ মিলিয়ন জোড়া জুতা তৈরি হয়। আভ্যন্তরীণ চাহিদার পঞ্চাশ ভাগ চাহিদাই মেটানো হয় দেশে তৈরী জুতা থেকে। বাংলাদেশে জুতা তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান অ্যাপেক্স-এর গাজীপুর কারখানায় প্রতিদিন বিশ হাজার জোড়া জুতা তৈরি হয়। চামড়ার তৈরী অন্যান্য সামগ্রীর চাহিদা তো আছেই, শুধু জুতা তৈরির এ পরিসংখান থেকেই এ দেশে চামড়াজাত পণ্যের বিপুল চাহিদা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

### চাহিদার যোগানে বাংলাদেশ

চামড়াশিল্পে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বরাবরই এগিয়ে আছে। বাংলাপিডিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী সত্তর দশকের শেষ দিক থেকেই বাংলাদেশ থেকে কাঁচা চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে যেখানে চামড়াখাতে রপ্তানিআয় ছিলো ষোল কোটি মার্কিন ডলার। ২০০৯ সালে তা এসে দাঁড়ায় আটাশ কোটি চুরাশি লাখ মার্কিন ডলারে। প্রতি বছরই এ খাতে ১০-১৫% হারে আয় বাড়ছে।[2]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক মহাব্যবস্থাপক তার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "২০১২-১৩ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে প্রায় আটানব্বই কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতে আয় একশ' তেরো কোটি মার্কিন ডলার। ১৫-১৬ তে একশ' ষোলো কোটি, ১৬-১৭ তে বাংলাদেশ একশ' তেইশ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে।[3]

বাংলাদেশের চামড়ার উল্লেখযোগ্য বাজার হলো– জাপান, ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত প্রভৃতি। পুমা, হুগো, বস ইত্যাদির মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে চামড়া সংগ্রহ করে। এছাড়াও টিম্বারল্যান্ড, এলডো ও এবিসি মার্টের মতো কোম্পানির জন্য জুতা তৈরি করে দেয় বাংলাদেশ।[4]

২০১৬ সালের নভেম্বরে লেদারটেক বাংলাদেশ তিনদিন ব্যাপী এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এর পূর্বে ২০১৩ সালে লেদারটেকের প্রথম প্রদর্শনীতে আটটি দেশের নব্বইটি কোম্পানী অংশ নিয়েছিলো। কিন্তু ২০১৬ সালে চামড়াজাত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উপস্থাপনের এ প্রদর্শনীতে পনেরোটি দেশের দুইশ পঞ্চাশটি কোম্পানী অংশগ্রহণ করে।[5] সে প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ বলেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০২১ সালে সরকার চামড়াশিল্পে পাঁচ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, বিশ্ববাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সেই সাথে একথাও আর অস্পষ্ট নয় যে, এ চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশ সবসময়ই লাভবান হয়ে আসছে। বর্তমানে গার্মেন্টস ও তৈরি পোষাক শিল্পের পর সবচে' বেশি রপ্তানিমুখী হলো চামড়াশিল্প।[6] ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত রপ্তানি নীতিতে চামড়াজাত পণ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের তালিকায় রাখা হয়েছে।[7] ২০১৭ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শেখ হাসিনা কর্তৃক এ পণ্যকে 'প্রোডাক্ট অফ দ্য ইয়ার-২০১৭' ঘোষণা করা হয়েছে।

সুতরাং একথা প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়, সারাবিশ্বে চামড়ার চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। আর সে চাহিদার যোগান দিয়ে বাংলাদেশ বরাবরই লাভজনক অবস্থানে রয়েছে। বিশ্ববাজারে এ পণ্যের মূল্যসূচক সবসময়ই উর্ধ্বমুখী। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের মূল্য বাস্তবিকভাবে কখনই নিম্নগামী হয়নি। বিষয়টা বোঝার জন্য খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন নেই। চামড়া দিয়ে তৈরী যে কোন পণ্য কিনতে গেলে একজন সাধারণ মানুষও সেটা ভালোভাবেই অনুভব করেন।

### কুরবানীর মৌসুম ও কওমী মাদরাসা

বাংলাদেশে চামড়ার বার্ষিক চাহিদার প্রায় ষাট ভাগের যোগান আসে কুরবানীকৃত পশু থেকে। সে কারণে চামড়ার মূল ব্যবসা গড়ে ওঠে কুরবানীর মৌসুমে। বাংলাদেশ ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১০ সালের কুরবানী ঈদে চামড়া সংগ্রহ হয়েছিলো পঁয়তাল্লিশ লাখ। ২০১১ তে এই সংখ্যা পঞ্চাশ লাখ ছাড়িয়ে যায়।[8] ২০১২ তে চামড়া সংগ্রহ হয় ষাট লাখের বেশি।[9] ২০১৩ তে পাওয়া যায় পঁয়ষট্টি লাখ চামড়া। ২০১৪ তে প্রায় সত্তর লাখ।[10] এভাবে প্রতিবছরই কুরবানীকৃত পশুর সংখ্যা বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে এ মৌসুমে সংগৃহিত চামড়ার সংখ্যা। বর্তমানে এই সংখ্যা কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই বিপুল সংখ্যক চামড়া সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলোর বিরাট অবদান রয়েছে। ঈদুল আযহার সময়ে মাদরাসার ছাত্ররা কুরবানীকৃত পশুগুলোর চামড়া পরম যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদের

---

১. ইত্তেফাক রিপোর্ট, ২৪ জানুয়ারী ২০১৫

২. বাংলাপিডিয়া, বিষয়: চামড়াশিল্প

৩. কৃষি সংবাদ.কম

৪. লাইভ টিভি রিপোর্ট, ১০ মে ২০১৬

৫. বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট, ৩ নভেম্বর ২০১৬

৬. ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারী ২০১৫

৭. কালের কণ্ঠ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬

৮.কালের কণ্ঠ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬

৯. বিবিসি বাংলা, ১৬ অক্টোবর ২০১৩

১০.বাংলাদেশ প্রতিদিন, ০৪ অক্টোবর ২০১৪

হাতে তুলে দেয়। নিজেদের ঈদের আনন্দকে ত্যাগের মহিমায় রঞ্জিত করে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কাজ আঞ্জাম না দিলে কুরবানীদাতা ও ব্যবসায়ী উভয়পক্ষকেই চরম বিপাকে পড়তে হতো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌসুমী ব্যবসায়ীরা এই বিরাট কর্মসূচী এতো চমৎকারভাবে কিছুতেই আঞ্জাম দিতে পারতো না।

যেহেতু বাংলাদেশের মোট চাহিদার অধিকাংশ চামড়া সংগৃহিত হয় কুরবানীর মৌসুমে আর কুরবানীর মৌসুমে চামড়ার বিরাট একটা অংশ আসে কওমী মাদরাসাগুলোর হাত ধরে। সেই হিসেবে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, চামড়াশিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নতি, সারাবিশ্বে এর ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধিতে কওমী মাদরাসাগুলো যথেষ্ট অবদান রেখে যাচ্ছে।

**মাদরাসাগুলোর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি**

কুরবানীর চামড়া নিজে ব্যবহার না করলে সরাসরি চামড়া বা তার মূল্য নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির কিছু মানুষকে সদকা করে দেয়া জরুরী। সেক্ষেত্রে কওমী মাদরাসাগুলোর লিল্লাহফান্ড এ দানের জন্য উৎকৃষ্ট একটি খাত। এখানে দান করলে গরীবের হক আদায় হওয়ার পাশাপাশি ইলমে দীনের সহযোগিতার সাওয়াবও অর্জিত হয়। কুরবানীদাতাদেরকে এ সুমহান সাওয়াবের অধিকারী করার জন্যই মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর চামড়া সংগ্রহের এ উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ইলমী ব্যস্ততা সত্ত্বেও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এ সময়ে নিজেদের মেধা, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে আর্থিকভাবে যতটুকু লাভবান হয়ে থাকেন, চামড়াশিল্পের উর্ধ্বমুখী বাজারের হিসাবে তা বরাবরই কম। তারপরও একটা সময় পর্যন্ত মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কাঁচা চামড়ার বিনিময়ে মোটের উপর ভালো মূল্যমান পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে চামড়ার দাম ধারাবাহিকভাবেই নিম্নগামী।

২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চামড়ার দর লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই পাঁচ বছরে চামড়ার দাম অর্ধেকেরও বেশি কমে এসেছে।[১] আগে যে চামড়াটি তিন হাজার টাকায় বিক্রি হতো, ২০১৭ সালে সে চামড়াই বারো তেরোশ'র উপরে বিক্রি করা যায়নি। ২০১৮-তে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ভালো মানের চামড়ার দামও নেমে এসেছে হাজারের নিচে। গ্রামের অনেক মাদরাসা তো এক পিস চামড়ার মূল্য পাঁচশ' টাকাও পায়নি।

**নিজের পায়েই কুঠারাঘাত!**

এ কথা বাস্তব যে, কওমী মাদরাসাগুলোর বার্ষিক আয়ের জন্য কুরবানীর চামড়া বড় একটি মাধ্যম। শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয়, বাস্তবিকভাবেও এটা শুধুই মাধ্যম। তা না হয়, মূল খাযানা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাতে। তিনি যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন। সে জন্যেই মাঝে মধ্যে দেখা যায়, যে বছর চামড়ার দাম কমে যায় সে বছর অনেক মাদরাসাতেই চামড়া সংগ্রহ হয় বিগত বছরের তুলনায় বেশি। ফলে চামড়ার দাম কম হওয়ার পরও টাকার পরিমাণ হয়ে যায় বিগত বছরের মতো বা তার কাছাকাছি। এতে চলতি বছরের বাজেটও খুব সুন্দরভাবেই পূর্ণ হয়ে যায়।

আবার কখনো দেখা যায়, চামড়ার দাম এবং সংখ্যা উভয়টা কম হলেও অন্যান্য মাধ্যম থেকে কাঙ্ক্ষিত অর্থের যোগান হয়ে যায়। আসলে মাদরাসাগুলোর মূল ভরসা তো আল্লাহ তা'আলার উপর। তিনি তাঁর উপর ভরসাকারীদের রিযিক কল্পনাতীত স্থান থেকে ব্যবস্থা করেন। যে কোন উপায়েই তিনি এসকল মাদরাসার প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। বস্তুত সকল সময়ে সকল অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর দীনের হেফাযত করেই যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

আর যদি মাদরাসাগুলো কখনো তাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থ না-ও পান, তবুও সেটা হবে মাদরাসাগুলোর জন্য একটা পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার। মাঝখান থেকে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যাবে ষড়যন্ত্রকারীদের।

সুতরাং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যদি চামড়ার দাম কমিয়ে মাদারিসে কওমিয়ার কোন ক্ষতি করার চিন্তা করে তাহলে সেটা হবে জেগে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখার মতো। তাদের জেনে রাখতে হবে– এধরনের কাজ করে আসলে তারা কওমী মাদরাসার কোন ক্ষতিই সাধন করতে পারবে না। বরং ক্ষতি যা হওয়ার তাদের নিজেদেরই হবে।

তাই তাদের কাছে শুধু এতটুকু আরয– "ব্যবসায় যৌক্তিক মুনাফা অর্জন করেও আপনারা ইচ্ছে করলে গরীবের হক আদায়ে সহযোগিতা ও দীনী মাদরাসার নুসরতে এগিয়ে আসতে পারেন। সে সুবর্ণ সুযোগ আপনাদের সামনে আছে। এমনকি সে জন্য আপনাদের মুনাফার অংশ থেকে নফল দান করাও জরুরী নয়। শুধু একটা জিনিস জরুরী– আর তা হলো, চামড়ার মূল্য নির্ধারণে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে হকদারকে তার ন্যায্য হক দিয়ে দেয়া। চামড়াশিল্পের ব্যবসায়ী হিসাবে এটা আপনাদের জন্য খুবই সহজ একটি সুযোগ। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না। নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা কিছুতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।"

**দাম কি আসলেই কমছে?**

নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম আজ আকাশছোঁয়া। এমনকি চামড়াজাত দ্রব্যের দামও কখনো কমছে না। কিন্তু আশ্চর্যের সাথে দেখতে হচ্ছে, বাংলাদেশে সম্ভবত চামড়াই একমাত্র বস্তু যার দাম দিন দিন কমছে।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ২০১৮ সালে ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা করে নির্ধারণ করে দেয় সরকার। হাস্যকর হলেও সত্য যে, ২০১৩ সালে ছাগলের চামড়াই ছিলো পঁয়তাল্লিশ টাকা বর্গফুট।[২] ২০১৮ সালে এসে গরুর চামড়ার জন্য সে দাম নির্ধারণ করা হয়। যদিও নির্ধারিত এ মূল্যেরও অনেক কমেই ব্যবসায়ীরা এবছর চামড়া কিনেছেন। তারপরও যদি আমরা ধরে নিই যে, তারা প্রতিবর্গফুট গরুর চামড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা করেই কিনেছেন, তাহলেও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি খরচ সব মিলিয়ে প্রতি বর্গফুট চামড়াতে খরচ পড়ে ৮৭ টাকা।[৩] এর বিপরীতে চামড়াশিল্প সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটগুলোতে দেখা যায়, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি বর্গফুট চামড়া বিক্রি হয় দুই ডলার থেকে তিন ডলারে।[৪] চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে চামড়া রপ্তানি সংক্রান্ত ব্যাংকের এলসি রেট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে গরু ও মহিষের গড় রপ্তানি মূল্য পাওয়া গেছে ২.২৫ ডলার। অর্থাৎ প্রতি ডলার চুরাশি টাকা হিসাবে ১৮৯ টাকা।[৫] এর মানে হলো, একজন রপ্তানিকারক প্রতি বর্গফুট চামড়ায় ৮৭ টাকা খরচ করে মূল টাকার পাশাপাশি মুনাফাই অর্জন করছেন একশ' দুই টাকা।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর রপ্তানি হচ্ছে প্রায় ত্রিশ কোটি বর্গফুট চামড়া।[৬] সে হিসাবে ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর খরচবাদে গড়ে প্রায় 'তিন হাজার কোটি' টাকা মুনাফা অর্জন করছেন। এরপরও

১. আমাদের সময়, ০৫ আগস্ট ২০১৮

২.বিবিসি বাংলা, ১৬ অক্টোবর ২০১৩

৩.যুগান্তর, ১২ আগস্ট ২০১৮

৪. বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ২৯ আগস্ট '১৭

৫.যুগান্তর, ১২ আগস্ট ২০১৮

৬.নয়া দিগন্ত, ২৫ আগস্ট ২০১৮

ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় অযৌক্তিকভাবে প্রতি বছরই চামড়ার দাম কমাচ্ছেন।

২০১৭-র ২০ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে প্রতি বর্গফুট চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা। যেটা ছিলো এর আগেরবারের মতোই। অথচ সে বৈঠকেই উপস্থাপন করা সভার কার্যপত্রের তথ্য হলো চামড়ার দর গতবারের চেয়ে বেড়েছে।[১] এতো সুস্পষ্ট তথ্যের পরও নিম্নমুখী করে চামড়ার দাম নির্ধারণ করা সত্যিই সন্দেহজনক।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যদি কোন জিনিসের দাম এমনিতেই কমে যায়, তাহলে হয়তো সেটাকে যৌক্তিক বলা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি সব ব্যবসায়ী একজোট হয়ে শুধু অতিমাত্রায় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কোন জিনিসের দাম কমাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন, তাহলে সেটার বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

চামড়ার দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বিষয়টা এমনই হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর দাম উর্ধ্বমুখী থাকলেও দেশীয় বাজারে ইচ্ছা করে নিম্নমুখী করা হচ্ছে। সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থপূরণকারী এ কাজকে পক্ষপাতদুষ্ট ও একপেশে নীতি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

**দাম কমানোর কথিত কারণ**

বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার পরও বাংলাদেশে চামড়ার দাম ইচ্ছাকৃতভাবে কমানোর পেছনে অনেকে ব্যবসায়ীদের পুঁজি স্বল্পতার যুক্তি দাঁড় করান। অথচ প্রতি বছর সরকার এ খাতে যে শত শত কোটি টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, সে ঋণের পরিমাণ গড়ে পাঁচ ছয় শ' কোটি টাকার কম হবে না। বাংলাদেশ ট্যানারি এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন আহমেদ দাবী করে বলেন, "চামড়ার দামের বেঞ্চ মার্ক হচ্ছে আমেরিকা। সেখানে যদি দাম কমে তাহলে সারা বিশ্বেই দাম কমে।"[২] শাহীন আহমেদ এ দাবী কিভাবে করছেন বোঝা যাচ্ছে না। আমরা কিন্তু ইতোপূর্বে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার দাম বাড়ার প্রমাণ পেয়েছি।

ঢাকার হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি পল্লী স্থানান্তরের বিষয়টাকেও কেউ কেউ চামড়ার দাম কমানোর কারণ হিসাবে দাঁড় করাতে চান। অথচ সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়েছে কমপক্ষে তিন বছর আগে। হাজারীবাগে ছিলো ১৫৫টি কারখানা। ২০১৭-র ঈদের আগেই সবাইকে প্লট বরাদ্দ দিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সে সময়ে ৬৭টি কারখানা চালুও হয়ে গিয়েছিলো। ঈদের আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, "সাভারের ট্যানারি পল্লীতে বিদ্যুতের কোন সমস্যা নেই। গ্যাস সংযোগের জন্য ১০৫টি আবেদন ছিলো, তিতাস কর্তৃপক্ষ সব ক'টিই অনুমোদন করেছে। ইতোপূর্বে হাজারীবাগে মাত্র ৩৪টি ট্যানারিতে গ্যাস সংযোগ ছিলো। সে দিকে লক্ষ্য করলে সাভারে গ্যাসের কোন সমস্যাই নেই।"[৩]

এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, সাভারে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর করার কারণে চামড়ার দাম না কমে আরো বাড়ার কথা ছিলো। বাস্তবতাও তা-ই। হাজারীবাগে ট্যানারি পল্লী নিয়ে দেশে-বিদেশে নেতিবাচক ধারণা থাকার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকান ব্যবসায়ীরা পরিবেশগত দিক থেকে বাংলাদেশের চামড়া কিনতে তুলনামূলক কম আগ্রহী ছিলো। কিন্তু সাভারে সে শিল্প স্থানান্তরের পর তারা বাংলাদেশের চামড়ার প্রতি পূর্বের চেয়ে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেন।[৪]

চামড়ার দাম দিন দিন কমার ব্যাপারে আখেরী ফায়সালা না দেয়া গেলেও এতটুকু ধারণা তো অবশ্যই করা যায় যে, একশ্রেণীর উচ্চাভিলাষী ব্যবসায়ীর হাতে চামড়াশিল্প আজ জিম্মি হয়ে আছে। চামড়ার দামের ধারাবাহিক নিম্নগতির পেছনে তাদের স্বার্থপর সিন্ডিকেটই কাজ করছে। এমনকি তারা চাইলে সে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রত্যেক মৌসুমে বিপুল পরিমাণ মুনাফার পাশাপাশি পরবর্তী বছরের বিনিয়োগের টাকাও তুলে ফেলতে পারেন। সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরের পর তারা এই অন্যায় কাজটিই করতে চাচ্ছেন। বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোরের ২৯ আগস্ট ২০১৭-র একটি রিপোর্টে পোস্তার ব্যবসায়ীদের এ মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সাভারে নতুন বিনিয়োগের টাকা জনগণের পকেট থেকে নেয়ার পায়তারা করছেন ট্যানারি মালিকরা।" কয়েকজন ট্যানারি মালিকও একই কথা কিছুটা ভিন্ন সুরে বলেছেন। তারাও চামড়ার দাম কমানোর পেছনে সাভারে ট্যানারি স্থাপনের বিরাট খরচ এবং সেখানে নতুন বিনিয়োগের ঘাটতির কথা উল্লেখ করছেন। তাদের এ কথার পর চামড়ার দাম কমার পেছনের মূল রহস্য বুঝে নেয়াটা কঠিন কিছু নয়।

যদি চামড়ার দাম কমানোর কারণ আসলেও এটা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা খুবই নিন্দনীয় এবং বিবেচনা বহির্ভূতকাজ। এভাবে সিন্ডিকেট পদ্ধতিতে ব্যবসা করাকে শরীয়তও সমর্থন করে না। আজকে তারা জনগণের হিস্যা কমিয়ে সে টাকা দিয়ে নতুন ব্যবসা গড়তে চাচ্ছে, কাল যদি তাদের ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে যায় এবং হাজার হাজার কোটি টাকা লাভ হয় তখন কি তারা সে লাভ থেকে জনগণকে হিস্যা দেবে? চামড়াশিল্পের অতিমাত্রায় মুনাফাকামীরা এমন করবে তা-তো স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

সুতরাং যৌক্তিক কথা এটাই–সাভারে নতুন স্থানে চামড়াশিল্প স্থাপন করে যে লাভবান হতে চাইবে, বিনিয়োগের চিন্তাও তাকেই করতে হবে। তা না করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চামড়ার দাম কমিয়ে সে বিনিয়োগ জনগণের পকেট থেকে নেয়ার চেষ্টা কি অন্যায় প্রচেষ্টা নয়? এর মাধ্যমে কি সাধারণ মানুষের হক নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি চামড়াশিল্পের মতো স্বার্থক ও সম্ভাবনাময় একটি শিল্প চরম হুমকির মুখে পড়ছে না? এ অন্যায় প্রচেষ্টার কারণে কি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে না?

চামড়া ব্যবসায়ের সাথে যে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই নিজেদের বিবেকের আদালতে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা উচিৎ। মুনাফার জন্য অতিমাত্রায় লালায়িত হয়ে বিবেককে পাশ কাটানো মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে না।

সর্বশেষ কথা হলো, সীমালঙ্ঘন কখনও ভালো ফল বয়ে আনে না। ভাবুন তো, কিছু স্বার্থপর মানুষের কাছে ঠকতে ঠকতে অসহায়-দরিদ্র জনগোষ্ঠী যদি চামড়া পঁচিয়ে সার বানানো কিংবা নবউদ্ভাবিত কোন পদ্ধতিতে চামড়া ব্যবহারের বিকল্প উদ্যোগ নেন তাহলে এসব স্বার্থপরেরা তখন কী করবেন? এবং যদি প্রচুর লাভজনক এ শিল্পের আমদানী থেকে বঞ্চিত হয় দেশ, বিশ্ববাজারে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ তাহলে কে নিবে এ ক্ষয়-ক্ষতির দায়? বিষয়টি নিয়ে সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

**লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা (দ্বিতীয় বর্ষ), জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।**

---

১.কালের কণ্ঠ, ২১ আগস্ট ২০১৭
২.নয়াদিগন্ত, ২৫ আগস্ট ২০১৮
৩.কালের কণ্ঠ, ২৯ আগস্ট ২০১৭
৪.বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ২৯ আগস্ট '১৭

**ব ড় দে র জী ব ন**

চলে গেলেন রাহবারে শরীয়ত ও তরীকত

# আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমাদ রহ.

**মুফতী সালমান বিন মানসুর**

**প্রবাদ আছে,** 'মওতুল আলিমি মওতুল আলামি' অর্থাৎ, একজন আলেমের মৃত্যু যেন গোটা পৃথিবীর মৃত্যু। সে হিসেবে ২৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার ছিল মুসলিম উম্মাহর অত্যন্ত বেদনাদায়ক দিন। এদিন সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ছেড়ে মাওলাপাকের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন শাইখুল আরব ওয়াল আযম কুতবুল আলম শাহ সোলতান আহমদ নানুপুরী রহ.-এর অন্যতম খলীফা, জামিয়া ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল ফেনী'র প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, পীরে কামেল, হাকীমুল উলামা আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ রহ.।

তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, গঙ্গুহী সিলসিলার সমকালীন শ্রেষ্ঠ বাহক, আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা মুফতী, বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ, যুগ সচেতন নির্ভীক দীনের কাণ্ডারী, সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূর্তপ্রতিক, অনন্য তাকওয়া-পরহেযগারী ও বহুগুণের অধিকারী বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তিনি মানুষকে শরীয়তের সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি হাজার হাজার পথহারা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে যান। আল্লাহভোলাা বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়ার সুমহান মেহনতে রত ছিলেন আজীবন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী বানান। তাঁর অবর্তমানে দীনী অঙ্গনে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণের জন্য তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করে দিন। আমীন।

এ মহান ব্যক্তির অনুপম জীবন চরিত ছিল অনুকরণীয়। তাঁর বিস্তারিত জীবনী পেশ করার জন্য হাজার পৃষ্ঠাও যথেষ্ট নয়। এ নিবন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করা হল।

**জন্ম ও পরিচিতি**

আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমাদ রহ. ১৯ চৈত্র ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, রোজ শুক্রবার জুমুআর নামাযের পূর্বে ফেনী জেলার অন্তর্গত ছনুয়া গ্রামের এক দীনদার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী এহসানুল্লাহ সওদাগর এবং মাতার নাম আসিয়া।

**বুযুর্গের ভবিষ্যদ্বাণী**

মুফতী সাহেব রহ.-এর পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন আলেম-উলামার প্রতি যথেষ্ট দুর্বল ও আন্তরিক। এজন্য সর্বদা কোনো আলেমকে তাঁদের ঘরে জায়গীর রাখতেন। অথচ তাঁদের ঘরে লেখাপড়া করার মত কোনো সন্তান ছিল না। সে হিসেবে মাওলানা কবীর আহমদ নামক একজন বুযুর্গ তাঁদের ঘরে জায়গীর থাকতেন। একবার মুফতী সাহেব রহ.-এর আব্বাজান উক্ত মাওলানা সাহেবসহ জুমুআর নামায আদায় করতে গেলেন। নামায শেষে বাড়িতে এসে নবজাত শিশুর কান্না শুনতে পেলেন। তখন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে জেনে উক্ত মাওলানা সাহেব বলেন, এ ছেলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে বড় আলেম হবে। বুযুর্গের এ ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে ষোলআনাই ফলে গেছে।

**শিক্ষা জীবন**

মুফতী সাহেব রহ.-এর ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তাঁর মাতা-পিতা তাঁকে জনৈক হিন্দু শিক্ষকের নিকট সোপর্দ করার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। একটি স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল, স্বভাবগতভাবে স্কুলে তার তন্ (শরীর) গেলেও মন যেতো না। এভাবে দু'বছর স্কুলে পড়ার পর তাঁকে স্থানীয় রহিমপুর মাদরাসায় ভর্তি করা হয়। মাদরাসার পড়া তাঁর স্বভাবের সাথে খাপ খাওয়ার কারণে মাদরাসায় ভর্তি করানোর সাথে সাথে পড়ালেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত মাদরাসায় তিনি জামাতে হাশ্তম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

অতঃপর তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব তাঁকে মিরসরাই জামালপুর মাদরাসায় ভর্তি করান। জামালপুর মাদরাসায় তিনি জামাতে দুওম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। উল্লেখ্য, জামালপুর মাদরাসায় জামাতে সুওম পর্যন্ত ছিল। তাঁর খাতিরে জামাতে দুওম খোলা হয়েছিল। প্রতি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

তিনি জামাতে হাফ্তমের বছর থেকেই নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে অভ্যস্ত হন। জামাতে চাহারমের বছর স্বপ্নে দেখলেন, কুতবুল আলম ইমামে রব্বানী পটিয়ার হযরত মুফতী আজিজুল হক সাহেব রহ. তাঁকে শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ সোলতান আহমদ নানুপুরী রহ.-এর হাতে তুলে দিয়েছেন। এজন্য তিনি চাহারমের বছর নানুপুরী হযরত রহ.-এর হাতে বাইআত হন।

জামালপুর মাদরাসা থেকে বিদায় নিয়ে পটিয়া মাদরাসায় যাওয়ার সময় তাকে এগিয়ে দিতে মুহতামিম সাহেবসহ সকল ছাত্র-শিক্ষক মাদরাসা থেকে দেড় মাইল দূরে 'চিনকি আস্তানা' নামক রেল স্টেশনে আসেন। স্টেশনে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। এর ফলে রেলগাড়ি ছাড়তেও বিলম্ব হয়।

তাঁর একান্ত উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব তাঁকে সাথে নিয়ে গিয়ে পটিয়া মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁর ভর্তি পরীক্ষা নেননি। পটিয়া মাদরাসায় যে সকল বিভাগ রয়েছে অর্থাৎ মুনাযারা বিভাগ, মুশাআরা বা কবিতা রচনা বিভাগ, আরবি সাহিত্য বিভাগ ও উর্দূ সাহিত্য বিভাগসহ প্রত্যেক বিভাগের পরিচালকগণ তাঁর নাম নিজেদের বিভাগে লিপিবদ্ধ করে ফেলেন। উপর্যুক্ত প্রত্যেক বিভাগেই তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। মুনাযারা বিভাগের যিম্মাদার তাঁর মুনাযারা করার যোগ্যতা দেখে তাঁকে 'সাইয়িদুল মুনাযিরীন' উপাধি দেন। বার্ষিক মুনাযারা ও কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন।

পটিয়া মাদরাসায় তিনি দু'বছর অধ্যয়ন করেন। প্রথম বছর ফুনূনাতে আলিয়া পড়েন। ফুনূনাতের কিতাব 'কাযী হামদুল্লাহ' পড়েছেন খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ রহ.-এর নিকট। তিনি কয়েকদিন পড়ানোর পর মুফতী সাহেবের যোগ্যতা অনুমান করতে পেরে

বলেন, আমাকে আর পড়াতে হবে না। আগামীকাল থেকে তুমি কিতাব দেখে এসে অর্থসহ বলবে আর আমরা শুনব। ফুনূনাতের বছরও প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

মুফতী সাহেব রহ.-এর ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রতি ছিল হযরত নানুপুরী রহ. সুদৃষ্টি ও তাঁকে গড়ার বিশেষ ফিকির। ফুনূনাতের কোর্স সমাপ্তির শেষের দিকে নানুপুরী হযরত রহ. মুফতী সাহেব রহ.-এর নিকট চিঠি পাঠিয়ে রমাযানের শেষ দশদিন নানুপুর মাদরাসায় তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করার জন্য মুফতী সাহেবকে নিয়ে যান। উক্ত দশদিনে তাঁর উপর নানুপুরী হযরত রহ.-এর তাওয়াজ্জুহ, তাজাল্লী, নসীহত ও যিকির-আযকারের অত্যন্ত প্রভাব পড়েছিল। একবার তিনি বলেছিলেন, ঐ দশদিনের সোহবতে এ রকম রূহানী তরক্কী অনুভব হয়েছিল যে, দশ বছরের সোহবতেও এ রকম হয় না। এমনকি এর প্রভাব অন্তর ছাপিয়ে শরীরেও পড়েছিল। ফলে ছয়মাস পর্যন্ত তাঁর খানার প্রতি আগ্রহ ছিল না।

ফুনূনাত পড়ার পর জামাতে উলায় ভর্তি হন। উক্ত জামাতে মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পড়েন আল্লামা দানেশ রহ.-এর নিকট। তিনি মুফতী সাহেব রহ.-কে তাঁর অনুপম চরিত্র ও যোগ্যতার কারণে খুবই ভালোবাসতেন। আর দরসের মধ্যে তাঁকে নিজের সামনেই বসাতেন। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি পেছনে বসলে তাঁকে সামনে এনে বললেন, তুমি সব সময় আমার সামনেই বসবে। কেননা তুমি সামনে না থাকলে আমার পড়ানোর স্পৃহা জাগে না।

মুফতী সাহেব রহ. মিশকাত শরীফ তাকরার করাতেন। আল্লামা দানেশ রহ. তাঁর তাকরার শুনে বলতেন, আমার মনমত যোগ্য আলেম দক্ষিণ দিকে একজনকে পাঠিয়েছি, পূর্ব দিকেও একজনকে পাঠিয়েছি। কিন্তু পশ্চিম দিকে পাঠানোর জন্য কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা আমার মনের আশা পূরণ করবেন। অতঃপর তিনি ছাত্রদেরকে মুফতী সাহেব রহ.-কে মুহাদ্দিস সাহেব বলার জন্য হুকুম করেন এবং নিজেও মুহাদ্দিস সাহেব বলে ডাকতেন।

মুফতী সাহেব হুযূর রহ. হিদায়া তৃতীয় খণ্ড পড়েন মুফতী ইবরাহীম রহ.-এর নিকট। তিনি যেদিন সবক শুরু করেন সেদিন সকল ছাত্র থেকে ইবারত শুনে বলেন, সাঈদ আহমদ! তুমিই সারা বছর ইবারত পড়বে। তাঁর কথামত সারা বছর তিনিই ইবারত পড়েন।

তিনি হিদায়াও তাকরার করাতেন। জামাতের মধ্যে মোট তিনটি গ্রুপ ছিল। মুফতী সাহেব তাকরার শুরু করার পর তাকরারের সব গ্রুপ ভেঙ্গে গিয়ে এক গ্রুপ হয়ে যায়। অন্য গ্রুপে যারা তাকরার করাতো তারাসহ সবাই তাঁর তাকরার শোনার জন্য একত্রিত হত।

জামাতে উলা পড়ার পর কয়েকজন উস্তাদের পরামর্শে তিনি হাদীস পড়ার জন্য পাকিস্তানে আল্লামা ইদরীস কান্দলবী রহ.-এর নিকট গমনের ইচ্ছা করলেন। হযরতজী রহ.-এর আব্বাও তাতে সম্মতি দিলেন। পাশাপাশি পটিয়া মাদরাসার তৎকালীন মুহতামিম হাজী ইউনুস সাহেব রহ. থেকে তিনি অনুমতি নিয়ে নিলেন। এরই মধ্যে ১৯৭০ সালে উভয় পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন হল। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ তথা বাঙ্গালীরা বিজয় লাভ করে।

হযরতজী রহ.-এর আব্বা আলেম না হলেও খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভাবলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীদের হাতে ক্ষমতা দিবে না, এ কারণে দেশ বিভক্তির আশঙ্কা রয়েছে। তাই তিনি হযরতজীকে পাকিস্তান যেতে নিষেধ করে দিলেন।

তারপর কতিপয় ব্যক্তি হযরতজী রহ.-কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি যেহেতু পটিয়া মাদরাসা হতে ছুটি নিয়ে এসেছেন, আর সেখানকার বুযুর্গদের থেকে বরকত হাসিল করেছেন, এখন হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখানকার বুযুর্গদের থেকেও বরকত নিলে ভালো হয়। কথাটি হযরতজী রহ.-এর নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হওয়ায় তিনি হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হয়ে গেলেন। অল্প দিনেই হযরতজী রহ. হাটহাজারী মাদরাসার সেরা ছাত্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় দাওরায়ে হাদীস জামাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের গোলযোগের কারণে সে বছর দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। যুদ্ধের কারণে বার্ষিক পরীক্ষা পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। ঐ পরীক্ষার ফলাফল হযরতজী রহ. জানতে পারেননি। দাওরায়ে হাদীস পড়ার পর তিনি এক বছর তাফসীর বিভাগে পড়াশোনা করেন।

**উস্তাদগণের খিদমত**

হযরতজী রহ.-এর ইলম ও উন্নত চরিত্রের কারণে তাঁর উস্তাদগণও তাঁকে খুব মহব্বত করতেন। তিনি লেখাপড়ার সাথে সাথে আসাতিযায়ে কেরামের খিদমতেও ছিলেন অগ্রগামী। বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শুক্রবারে শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুল কাইয়ূম রহ.-এর বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন কাজ-কর্ম করে দিতেন। ধান বোনার সময় হলে তিনি তার ক্ষেতে ধানও বুনে দিতেন।

**কর্ম জীবন**

**ছাগলনাইয়া আজীজিয়া মাদরাসায় খিদমত**

মুফতী সাহেব রহ. কখন কী করবেন এ ব্যাপারে তাঁর শাইখ নানুপুরী হুযূর রহ. পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতেন। সে হিসেবে নানুপুরী হুযূর রহ. মনে মনে স্থির করলেন, তাঁকে ফেনী জেলাধীন ছাগলনাইয়া আজীজিয়া মাদরাসাটি গড়ার জন্য পাঠাবেন। সে সময় আজীজিয়া মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন নানুপুরী হুযূর রহ.-এর খলীফা হযরত মাওলানা বজলুর রহমান সাহেব রহ.। তিনি ছিলেন অধিক যিকিরকারী মাজযুব প্রকৃতির বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। উক্ত মাদরাসাটির বয়স পনের বছর হলেও তাতে লেখাপড়ার তেমন উন্নতি হচ্ছিল না। কোনো উস্তাদ সেখানে বেশিদিন টিকতো না।

অপরদিকে তাফসীরের বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন বড় বড় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে উস্তাদ হিসেবে পেতে যোগাযোগ শুরু করলো। কক্সবাজারের একটি মাদরাসায় তাঁকে বুখারী শরীফ পড়ানোর জন্য শাইখুল হাদীস হিসেবে নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু মুফতী সাহেব হুযূর রহ. তো নিজের ইচ্ছার রশি তাঁর শাইখের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রাণপ্রিয় শাইখ যখন বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে ছাগলনাইয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে পাঠাতে ইচ্ছা করেছি, এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী?' তখন মুফতী সাহেব হুযূর রহ. বলেছিলেন, এটাতো আজনবীর মত কথা হলো। আমাকে যদি আপনি রাস্তায় বসে থাকতে বলেন, এতেও আমি রাজি আছি। বস্তুত একেই বলে ফানা ফিশ-শাইখ।

যাই হোক, মুফতী সাহেব রহ.-এর উত্তর শুনে নানুপুরী হুযূর রহ. খুশি হয়ে বললেন, আমি তোমার থেকে এ ধরনের উত্তরই আশা করেছিলাম। হযরত মুফতী সাহেব রহ. স্বীয় শাইখের নির্দেশনা মোতাবেক ছাগলনাইয়া মাদরাসায় চলে আসেন। মাদরাসায় গিয়ে দেখলেন, করুণ অবস্থা। মাদরাসার শ্রেণি আছে

মাত্র দহম (৪র্থ শ্রেণি) পর্যন্ত। তাতেও ছাত্র আছে ৬/৭ জন। আর দুপুরের মকতবে ছাত্র হয় বিশজনের মত।

এদিকে হাটহাজারী মাদরাসা, পটিয়া মাদরাসা, জামালপুর মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরাম ও তাঁর খাস উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব এবং তাঁর আব্বাসহ সবাই ছাগলনাইয়া মাদরাসায় যাওয়াতে অসন্তুষ্ট হন। কেননা তাঁরা পূর্ব থেকেই জানতেন, ছাগলনাইয়া মাদরাসার বয়স পনের বছর পার হলেও এর কোনো উন্নতি হয়নি। আর সবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, মুফতী সাহেব হুযূর রহ. কোন দাওরায়ে হাদীস মাদরাসায় হাদীস-তাফসীরের কিতাব পড়াবেন।

যাই হোক, মুফতী সাহেব রহ. তাঁর শাইখের নির্দেশনা মোতাবেক ছাগলনাইয়া মাদরাসায় পাহাড়ের মত অটল হয়ে পড়ানো আরম্ভ করলেন। মুহতামিম সাহেব রহ. বললেন, আপনার বেতন ষাট টাকা নির্ধারণ করা হল। হযরতজী রহ. আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে বললেন, আমি তো ষাট টাকারও যোগ্য নই। অথচ তাঁকে ইতোপূর্বে পাঁচশত টাকা বেতনে শাইখুল হাদীস পদে নেয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। অথচ সে সময় হাটহাজারী মাদরাসার শাইখুল হাদীসের বেতনও ছিল তিনশত টাকা। এ ঘটনাটি নিঃস্বার্থ দীনী খিদমত এবং স্বীয় শাইখের প্রতি ফানাইয়্যাতের একটি জোরালো দৃষ্টান্ত।

ছাগলনাইয়া মাদরাসায় গিয়ে হযরতজী রহ. মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করতেন। অনেক সময় বাবুর্চি ও বড় ছাত্র না থাকায় নিজেই রান্না করে করে ছাত্রদেরকে খাওয়াতেন। মাদরাসার টয়লেট পরিষ্কার করতেন। মাদরাসার ফান্ডে টাকা না থাকায় বাজারে গিয়ে কালেকশন করতেন। মকতবে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে পড়াতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর অক্লান্ত মেহনতের ফল প্রকাশ পেতে লাগল। মাদরাসার ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। একই বছর নহম ও হাশ্‌তম দুই জামাত খোলা হল। প্রথম বছরে পড়ালেখার উন্নতি দেখে তাঁর শাইখ হযরত সোলতান আহমদ নানুপুরী রহ. বললেন, ইনশাআল্লাহ মাদরাসার উন্নতি হবে। তিনি আরো বললেন, জামাতে উলা পর্যন্ত খোলার পর আরো দুই বছর সেখানে পড়াবে, তারপর তোমার দায়িত্ব শেষ।

হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর মেহনতে ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাথে সাথে প্রত্যেক বছর নতুন জামাত খোলা হচ্ছিল। আলহামদুলিল্লাহ সাত বছরের মাথায় জামাতে উলা খোলা হয়েছিল। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাদরাসাটি তা'লীম-তরবিয়াত উভয় ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়ে জমজমাট ও মনোরম এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

জামাতে উলা খোলার পর আরো দু'বছরসহ মোট নয় বছর তিনি ছাগলনাইয়া মাদরাসায় কর্মরত ছিলেন।

**খিলাফত লাভ**

হযরত মুফতী সাহেব রহ. ছাগলনাইয়া মাদরাসার লেখাপড়া ইত্যাদির উন্নতিকল্পে যেমন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন, অনুরূপভাবে আত্মশুদ্ধির জন্য যিকির, অযীফা, তিলাওয়াত ইত্যাদিও পরিপূর্ণভাবে আদায় করতেন। তিনি নানুপুরী হুযূর রহ.-এর নির্দেশনানুযায়ী ছাগলনাইয়া মাদরাসায় যাওয়ার পর প্রথম দিকে তিন রমাযানে তিন চিল্লা ই'তিকাফ করেন। উক্ত ই'তিকাফের ২/১ বছর পর নানুপুরী হযরত রহ. তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ বছর।

**নানুপুর মাদরাসায় নিয়োগ**

হযরত মুফতী সাহেব রহ. সুদীর্ঘ নয় বছর ছাগলনাইয়া মাদরাসায় অবস্থান করে মাদরাসাটি আবাদ করে দেন। ১৪০০ হিজরীতে তিনি নানুপুর মাদরাসা মসজিদে রমাযানের শেষদশক ই'তিকাফ করেন। তখন নানুপুর মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা যমীরুদ্দীন রহ. এবং নায়েবে মুহতামিম মাওলানা সুলাইমান রহ. মুফতী সাহেব রহ.-কে নানুপুর মাদরাসায় নিয়োগের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন। হযরত শাইখ সোলতান আহমদ নানুপুরী রহ.-ও এতে সম্মতি প্রকাশ করেন। সাথে সাথে ছাগলনাইয়া মাদরাসা থেকে বিদায় নেয়ার পদ্ধতিও বাতলে দেন। তাঁর বাতানো পদ্ধতিতে তিনি ছাগলনাইয়া মাদরাসা হতে বিদায় নিয়ে ১৪০০ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৫ তারিখে নানুপুর মাদরাসায় যোগদান করেন।

**ফাতাওয়ার খিদমত**

নানুপুর মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার একদিন পর নানুপুরী হুযূর রহ. ঘোষণা দিলেন, আজ হতে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে মাদরাসায় দারুল ইফতা বা ফাতাওয়া বিভাগ খোলা হল এবং মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেবকে মুফতী বানানো হলো। আর ছাত্রদেরকে বলে দিলেন যে, তোমরা প্রয়োজনীয় মাসআলা তাঁকে জিজ্ঞেস করবে এবং সাধারণ মানুষকেও জিজ্ঞেস করতে বলে দিবে। মুফতী সাহেব রহ. বললেন যে, তিনি তো কোনো ইফতা বিভাগে ভর্তি হননি এবং কারো কাছ থেকে ফাতওয়া দেয়া শিখেননি! এটা বলার পরও যখন নানুপুরী হযরত রহ.এর মুবারক যবানে ফাতাওয়া দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো, তিনি বুঝতে পারলেন, এতে আল্লাহ পাকের কোনো বিশেষ রহস্য আছে এবং নিশ্চয় এতে আল্লাহ পাকের পাকের পক্ষ হতে মদদ করা হবে। অতঃপর তিনি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ফাতওয়া লেখা আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর মাধ্যমে ফাতওয়া বিভাগের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম মুফতী সাহেব রহ.-এর নিকট তাঁদের ফাতওয়া সত্যায়নের জন্য প্রেরণ করা আরম্ভ করেন। তিনি যিন্দেগীতে কখনও পাকিস্তান যাননি। তা সত্ত্বেও তাঁকে পাকিস্তানের মুফতী বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাকিস্তানের জামি'আ বানূরী টাউনের তৎকালীন প্রধান মুফতী সাহেব কয়েকটি মাসআলা ও রেসালা সত্যায়নের জন্য এবং মন্তব্য লেখার জন্য মুফতী সাহেব রহ.-এর নিকট প্রেরণ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে বিস্তারিত মন্তব্য লিখে পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার মুফতিয়ানে কেরাম তা পছন্দ করেছেন। জামি'আ বানূরী টাউন থেকে প্রকাশিত 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া' নামক বিরাট ফাতাওয়া গ্রন্থে তাঁর প্রদত্ত কয়েকটি ফাতাওয়াও স্থান পেয়েছে। আবুধাবীর ওয়াক্‌ফ সচিব শাইখ বশীর মালেকী মাযহাবের অভিজ্ঞ আলেম। তিনি একবার মুফতী সাহেব রহ.-এর নিকট কয়েকটি প্রশ্ন লিখে পাঠান। মুফতী সাহেবের পক্ষ থেকে উত্তর পেয়ে তিনি যারপরনাই খুশী হন। একবার এরশাদ সরকারের আমলে মুফতী ওয়াক্কাস সাহেবকে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বানিয়ে তাঁর মধ্যস্থতায় বাংলাদেশের খ্যাতনামা মুফতিয়ানে কেরামের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল। চট্টগ্রামে পাঠানো কপির উত্তরের দায়িত্ব হাটহাজারী, পটিয়া, নানুপুর ও বাবুনগর মাদরাসার মুফতীগণের নিকট অর্পণ করা হয়েছিল। সবার লিখিত ফাতওয়ার মধ্যে মুফতী সাহেবের লিখিত দীর্ঘ ৫২ পৃষ্ঠার ফাতওয়াটি হাটহাজারী মাদরাসায় হযরত আল্লামা ইসহাক গাজী রহ.-এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'ফাতাওয়া যাচাই বৈঠক'-এ গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিল। নানুপুরী হযরত রহ. ও পটিয়ার হাজী ইউনুস সাহেব রহ. ফাতওয়ার কপিটি নিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মুফতী ওয়াক্কাস সাহেবের বৈঠকে তাশরীফ নিয়েছিলেন।

দেশ-বিদেশ থেকে পাঠানো প্রশ্নসমূহের জবাব দেয়ার সাথে সাথে তিনি মাসিক আর-রশীদের ফাতাওয়া বিভাগের প্রশ্নসমূহের জবাবও লিখতেন।

**ভারতে আন্তর্জাতিক মুফতী সেমিনারে আমন্ত্রিত**

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ (ভারত)-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি জটিল বিষয়ের শরয়ী সমাধানের জন্য হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর নিকট কয়েকটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল। তাঁর পক্ষ থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে তাঁরা খুশি হয়ে ১৯৯১ সনে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের 'মাহমুদ' হলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুফতী সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে দাওয়াত দেন এবং তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারে তিনি উর্দূ ভাষায় সারগর্ভ আলোচনা করেন। তাঁর উত্তর উপস্থিত অধিকাংশ মুফতিয়ানে কেরামের রায়ের সাথে মিলে যাওয়ায় গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। আবার ১৯৯২ সালের আন্তর্জাতিক মুফতী সেমিনারের মুনাযারা অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

**বিভিন্ন মুফতী বোর্ডের সদস্য**

মুফতী সাহেব রহ.-কে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ মুফতী বোর্ডে শুরুলগ্ন থেকেই সদস্য বানানো হয় এবং ঐ বোর্ডের দশ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ কমিটিরও সদস্য করা হয়।

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার পক্ষ থেকে 'আল বুহুসুল ইসলামী' নামক দশ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত ফাতওয়া বোর্ডের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁকে সদস্য মনোনীত করা হয়। ২০০৮ সনে নারী নীতিমালার আপত্তিকর ধারাসমূহ সংশোধন করার লক্ষ্যে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মাধ্যমে ২০ সদস্য বিশিষ্ট শীর্ষস্থানীয় মুফতিয়ানে কেরামের যে কমিটি করা হয়েছিলো তাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

**গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ**

নানুপুর মাদরাসায় থাকাকালীন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিম্নরূপ–

১.ফাতাওয়া বিভাগের প্রধান ২. শিক্ষা পরিচালক ৩. হাদীস ও ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহের অধ্যাপনা ৪. আঞ্জুমানে সোলতানিয়া বাংলাদেশের মহাসচিব ৫. মাসিক আর-রশীদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাছাড়া নানুপুরী হযরত রহ. তাঁর দ্বারা বাইরের অনেক মাদরাসার তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের কাজ আঞ্জাম দিতেন। আর কোনো কোনো মাদরাসার পুরো দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। একাধিক মাদরাসার ভিত্তিও তাঁর মাধ্যমে স্থাপন করেছিলেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ফেনী জামিয়া ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল (মাদরাসা)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শাইখুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধান করেছেন।

**শিক্ষকতায় অবদান**

নানুপুর মাদরাসায় থাকাকালীন যেভাবে মুফতী সাহেবের দ্বারা ফাতওয়ার দিক দিয়ে উম্মত ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়, এমনিভাবে তাঁর দরসের দ্বারাও অভাবনীয় উপকৃত হয় ছাত্ররা। প্রথম বছর থেকে শেষ পর্যন্ত রদ-বদল হয়ে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ তাঁর দরসে এসেছিল– গুলিস্তাঁ, নাহবেমীর, মেরকাত, কুতবী, মাকামাতে হারীরী, তাওযীহ, মুসাল্লামুস সাবুত, শরহুল আকাইদ, হিদায়া, সুনানে নাসাঈ, তাফসীরে বায়যাবী, সুনানে তিরমিযী (২য় খণ্ড), সহীহ মুসলিম (কামেল)। জামিয়া সোলতানিয়া লালপোলে তিনি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত বুখারী শরীফ এবং ফাতাওয়া বিভাগের 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের দরস প্রদান করেন।

**নানুপুরী হযরত রহ.-এর সঙ্গে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সফর**

নানুপুরী হযরত রহ. মুফতী সাহেব রহ.-কে উম্মাহর জন্য কামেল-মুকাম্মাল করে গড়ে তুলতে সর্বদা ফিকিরমন্দ ছিলেন। এজন্যে যেমনিভাবে তিনি তাঁকে নানুপুর মাদরাসায় এনে দীর্ঘ সময় নিজের কাছে রেখেছেন তেমনিভাবে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ সফরেও তাঁকে সফরসঙ্গী করেছেন। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকী মহাসম্মেলনে যোগদানের সময় তিনি হযরত মুফতী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে নানুপুরী হযরত রহ. তাঁর আখেরী হজ্জের সফরেও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

**নানুপুরী হযরত রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র লিখার খিদমত আঞ্জাম দান**

নানুপুরী হযরত রহ. তাঁর গুরুত্বপূর্ণ চিঠি-পত্র মুফতী সাহেব রহ.-এর মাধ্যমেই লিখাতেন। বহু খলীফার খিলাফতের চিঠিও তিনি তাঁর হাতেই লিখিয়েছিলেন। অন্য সব বিষয়ের মত এ বিষয়েও তিনি ছিলেন নানুপুরী হযরতের একান্ত আস্থাভাজন। নানুপুরী হযরত রহ. স্বীয় খলীফাদের নামের দু'টি রেজিস্ট্রিখাতা বানিয়েছিলেন। এর একটি তিনি নিজের কাছে রাখতেন আর অপরটি রাখতেন মুফতী সাহেব রহ.-এর কাছে। নানুপুরী হযরত রহ.-এর ইন্তিকালের পর তার সমস্ত খলীফার নাম হযরত মুফতী সাহেব রহ. সেই খাতা হতে মাসিক আর-রশীদে প্রকাশ করেছিলেন।

**নানুপুর মাদরাসা থেকে বিদায়**

মুফতী সাহেব রহ. দীর্ঘ উনিশ বছর পর্যন্ত নানুপুর মাদরাসায় অবস্থান করে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ অত্যন্ত সচেতনতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে আঞ্জাম দেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ কারো পক্ষ থেকে তাঁর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। বরং সকলের মুখ থেকে তাঁর ব্যাপারে প্রশংসাই শোনা গেছে। নানুপুরী হুযূর রহ.-এর ইন্তিকালের পরও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে মুহতামিম হযরত মাওলানা যমীরুদ্দীন সাহেব রহ. তাঁকে বিদায় জানাতে রাজী ছিলেন না। বরং আজীবন উল্লিখিত দায়িত্বাবলীসহই তাঁকে ধরে রাখতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু কুতবুল আলম হযরতজী নানুপুরী রহ. মুফতী সাহেব রহ.-এর ব্যাপারে হুকুম জারী করেছিলেন যে, আমার ইন্তিকালের পর তুমি ফেনী লালপোলস্থ সোলতানিয়া মাদরাসায় গিয়ে খিদমত আঞ্জাম দিবে। তাই হযরতের অসিয়ত মোতাবেক ১৪২০ হিজরীর শা'বান মাসে তাঁর তা'লীমাতী ইন্তিযামের মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষা সমাপ্ত করে তিনি নানুপুর মাদরাসা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

**(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)**

**লেখক : নায়েবে মুহতামিম,**
**জামিয়া সোলতানিয়া লালপোল, ফেনী**

**পা নি ন য় ! ম রী চি কা**

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯) দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

# সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-২০

**(পূর্ব প্রকাশিতের পর)**

স্ত্রীর ইন্তিকালের পর ভাইজান এখন একদম একা। ভোর হলে সন্ধ্যা আসে না, সন্ধ্যা হলে রাত পোহায় না। নিঃসঙ্গ জীবন যেন কূল-কিনারাহীন। শারীরিকভাবে তো তিনি আগে থেকে অসুস্থ। হার্টের ও ডায়বেটিসের রোগী। এখন তো রোগই যেন তার একমাত্র সম্বল। অগত্যা দেহটাকে বহন করে অফিসে নিয়ে যান। অফিস শেষে বাসায় ফেরেন। বাসায় ভুতুড়ে নীরবতা। কাজের বুয়া বিকেলে এসে রান্না করে দিয়ে যায়। পরবর্তী বিকেল পর্যন্ত এক রান্নাই চলে। ভাত-তরকারি গরম করতে হলে নিজেই করে নেন। অবশ্য এখন নিয়মিত মসজিদে এসে নামায আদায়ের চেষ্টা করেন। মসজিদে এলে আর বাসায় যেতে মন চায় না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট পিলারের পাশে বসে বসে তাসবীহ জপেন। পূর্ব থেকেই তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। এখনতো অনেকটা পাথরের মত হয়ে গেছেন। একান্ত ঘনিষ্ঠদের সঙ্গেও মাত্র দু'চারটা কথা বলেন। আমাকে অবসর পেলে ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করেন। বলেন, বাসাটা এখন গভীর অরণ্যে পরিণত হয়েছে। যেদিকে তাকাই শুধুই অন্ধকার দেখি। এত নির্জনতায় কোন মানুষের বাঁচা সম্ভব নয়। মাঝে-মধ্যে জিজ্ঞেস করেন, আপনার ভাবীর জন্য কী করতে পারি? কী আমল করলে সে বেশি উপকৃত হবে? আমি যে টাকাটা ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছি তাতে যাকাত আসবে কিনা? কখনো বলেন, আপনার ভাবীর ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে আপনাদের মাদরাসায় এক গাড়ি ইট দিবো। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিছুদিন পর জানালেন, নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য বিবাহের চিন্তা-ভাবনা করছেন। আমি শুনে জোরালো সমর্থন দিলাম। বললাম, অবশ্যই সঠিক চিন্তা। ইসলাম পুরুষ মহিলা কারো ক্ষেত্রেই এমন নিঃসঙ্গ জীবন পছন্দ করে না। যদিও বর্তমান সমাজ এমন ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় বিবাহে নিরুৎসাহী করে। এখনকার সামাজিকতা মূলত অজ্ঞদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা যে বোঝে না, তা-ও বোঝে না। এমন সমাজের তোয়াক্কা করার দরকার নেই। আপনি অগ্রসর হোন। ইনশাআল্লাহ ভালো হবে।

অল্প দিনের মধ্যেই তার ভাবনা বাস্তবতার মুখ দেখল। তার এক ফুফাতো বোন আছে। বিধবা। একটি কন্যা সন্তান রেখে তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন। বোনটি দেখতে সুশ্রী নয়। আর ভাইয়ের এখন সে চাহিদাও নেই। কাজেই সহজেই কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। নিজ বাসায় খুবই ছোট্ট পরিসরে বিবাহ সম্পন্ন হলো। বিবাহ পড়ানোর জন্য ছিলাম আমি। আমার সাথে আরেকজন দীনী ভাই আর তার ছোট ভাই ও মেয়ের বড় ভাই ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মেহমান সে অনুষ্ঠানে ছিলো না। বিবাহের পর মিষ্টি আর কয়েক প্রকার ফল দিয়ে মেহমানদারী করালেন। অনুষ্ঠান শেষে তাদের শান্তিময় ভবিষ্যত কামনা করে আমরা চলে আসলাম। এ বিয়েতে তার দু'পুত্রের কারো কোন সমর্থনও ছিলো না, আপত্তিও ছিলো না।

শুরু হলো ফের নতুন জীবন। বিরান বাড়িতে নতুন ঘর! ভাইজানের স্ত্রীর কন্যা সন্তানটি সম্ভবত কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে চলে গেছে। এদিকে বিবাহ করে তার মানসিক কিছু উন্নতি হলেও শরীরের উন্নতি আর হলো না। ক্রমেই যেন ঝিমিয়ে পড়ছেন। ইতোমধ্যে চাকরি থেকে অবসর পেয়েছেন। এখন বাসা আর মসজিদ। এছাড়া প্রয়োজনীয় বাজার-ঘাট আর মাঝে-মধ্যে ডাক্তারখানা। প্রতি নামাযান্তে নামাযের স্থানে বসে দীর্ঘ সময় নীরবে তাসবীহ পড়েন। কেউ খোঁজ-খবর জানতে চাইলে শুধু জবাব দেন। আগে বেড়ে তেমন কিছু বলেন না। এ অবস্থায় প্রায় এক-দেড় বছর কেটেছে। এরপর বেশ কিছুদিন আর মসজিদে আসছেন না। খবর নিয়ে জানতে পারলাম তিনি অসুস্থ। অতঃপর জানলাম তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার সুস্থতার জন্য মসজিদে দু'আও হলো। অবশেষে সংবাদ এলো, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। এটাও জানতে পারলাম, তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। মৃত্যু সংবাদের পাশাপাশি স্ত্রীর এ সংবাদে পরিচিতরা সকলেই দুশ্চিন্তায় পড়লো। কারণ মরহুমের ছেলেরা নিশ্চয় এ মহিলাকে তাদের পৈত্রিক বাসায় থাকতে দিবে না। বঞ্চিত করবে তাদের বিমাতাকে। স্বীকৃতি দিবে না বৈমাত্রেয় ভাই কিংবা বোনকে। এদিকে বড় ছেলে জানিয়ে দিলো, সে বিদেশ থেকে আসলে তার পিতার জানাযা হবে। কাজেই গোসল ও কাফন শেষে মরহুমের লাশ হিমাগারে রাখা হলো এবং বড় ছেলে আসার পর রাজারবাগীর শিষ্য তার ছোট ছেলে জানাযা পড়ালো। আমি কোন কারণে সে জানাযায় শরীক থাকতে পারিনি।

মরহুম পিতার দাফন শেষে বড় ছেলে বেশ কিছুদিন দেশে ছিলো। দেখা হলে বলতো, সৎ মায়ের বিষয় নিয়ে ঝামেলায় আছি। একটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত যেতে পারছি না। এর কিছুদিন পর জানালো, সমাধান হয়ে গেছে। তাকে আমরা আঠারো লক্ষ টাকা দিব। সে তার পিত্রালয়ে চলে যাবে। দু'চার দিনের মধ্যে আমিও অস্ট্রেলিয়া চলে যাবো। আর আব্বা-আম্মার নামে আপনাদের মাদরাসায় কিছু দান করে যাবো। সেই দান সম্ভবত আর করা হয়নি।

এরপর প্রায় একবছর এ পরিবারের কারো ব্যাপারে কিছু জানার সুযোগ আমাদের হয়নি। গত রমাযানে একদিন বড় ছেলের সাথে দেখা হলো। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলাম। বললো, কয়েকদিন হলো দেশে আসলাম। ছোট ভাইটা আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই বাকি রাখেনি। কাজেই বাস্তুহারার মতো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। তার কথা শুনে বুঝলাম, তার ছোট ভাই বাসাটা কাউকে ভাড়া দিয়ে রেখেছে। রাজারবাগীর আস্তানায় থাকে আর মাসে মাসে ভাড়া উঠিয়ে নিয়ে যায়।

প্রিয় পাঠক! এ হলো সুখ-সন্ধানী একটা পরিবারের সুখভোগের অতি সংক্ষিপ্ত নমুনা। মানুষ সুখে থাকার জন্য কম সন্তান আশা করে। সন্তানদেরকে দুনিয়াদার বানায়। কষ্ট করে ঘর-বাড়ি তৈরি করে। বৈধ-অবৈধ পথে অর্থ-কড়ি উপার্জন করে। নিজেদের দীনদারী কাটছাট করে সন্তানদের দুনিয়া সাজায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় এ সন্তানেরা পিতা-মাতাকে এমনই প্রতিদান দেয়। তখন হয়তো অসহায় বাবা-মা নিজের ভুল বুঝতে পারে। এ ভুল বুঝতে পারায় লাভটা কী হয়? তখন না দুনিয়া ঠিক করা যায়, আর না আখিরাত। এ চিত্র আজ প্রায় প্রতিটি ঘরে। এরপরেও কেন যেন মানুষের ঘোর কাটে না।

**-আবূ তামীম**

======================

**(১৩ পৃষ্ঠার পর; ওয়াযাহাতি বয়ান)**

**মাওলানা আব্দুল বার সাহেব দা.বা.**

(ইঞ্জিনিয়ার হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব রহ.-এর সাহেবযাদা)

... উম্মতের উপর এতো বড় একটা ধাক্কা আর এতো বড় একটা ব্যথা, যার ফলে তাবলীগের এই মেহনতকে সামলাবার জন্য উলামায়ে কেরামকে তাদের সমস্ত জরুরী মাশাগেল কোরবান করে আজ সময় দিতে হচ্ছে, কষ্ট করতে হচ্ছে!

এই সমস্যার মূল কোথায়, আমাদের আকাবিরদের তরয (কর্মপদ্ধতি) কী ছিলো আর এখন তরয কী হয়েছে, সেটারই একটুখানি আপনাদেরকে শোনাতে চাচ্ছি–

**প্রথম হযরতজীর তরয :** মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহ. যখন ১৯৮৭ সনে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন তখন এক মজমায় তিনি কিছু কথা বলেছিলেন। শুরুতেই মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহ. বলেন,

بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے بڑوں کا کیا طرز تھا، ایک دفعہ عصر کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحبؒ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کا خط آیا، جس میں اس نے کوئی تعویذ طلب کیا، تو حضرت مولانا الیاس صاحبؒ جواب لکھوایا، مجھے اب تک وہ الفاظ یاد ہے، "میرے عزیز و دوستو! نہ میں عالم ہوں نہ میں عامل ہوں، گمنامی میں پڑا ہوا ہوں، تبلیغ کے ساتھ لگا رہنا چاہتا ہوں جانتا یہ بھی نہیں،"

অর্থ : কথা শুরু করার পূর্বে একটি বিষয় আরয করতে চাই যে, আমাদের বড়দের কর্মপদ্ধতি কী ছিল– একবার আমি আসরের পর হযরতজী ইলিয়াস সাহেব রহ.-এর খেদমতে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তির চিঠি আসলো। চিঠিতে তাবীজ লিখে দেয়ার আবেদন করা হয়েছিল। মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. চিঠিটির যে উত্তর লিখিয়েছিলেন, তা আজো আমার শব্দে শব্দে স্মরণ আছে। হযরতজী লিখিয়েছিলেন, "প্রিয় ভাই ও বন্ধু! আমি আলেমও নই, আমেলও নই, অর্থাৎ আমার ইলমও নেই এবং তাবীজ-তুমারও দিতে পারি না] এককোনে লুকিয়ে পড়ে আছি। তাবলীগের কাজের সঙ্গে লেগে থাকতে চাই, পারি না সেটাও করতে।"

এটা নিজের সম্বন্ধে প্রথম হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ.-এর মন্তব্য। মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহ.-এর বয়ানের এ অংশটি আব্বাজান ইঞ্জিনিয়ার হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব রহ.-এর একটি নীল নোট খাতায়– যেটা তিনি বয়ান লেখার কাজে ব্যবহার করতেন– তার মধ্যে পেয়েছি।

**দ্বিতীয় হযরতজীর তরয :**

مولانا یوسف صاحبؒ کے زمانہ میں ایک جماعت بھیجی مولانا یوسف صاحبؒ نے، جس میں بڑے بڑے افسران اور ڈاکٹر تھے، واپسی پر حضرت نے پوچھا کیا سمجھا؟ انہوں نے بتایا یہ کام بہت اچھا ہے، ہم میں فلاں شخص بہت اچھا کام جانتا ہے، تو حضرت مولانا یوسف صاحبؒ نے ٹھنڈا سانس بھر کر فرمایا یہ تبلیغ کوئی نہیں جانتا!

অর্থ : মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. স্বীয় যামানায় (কোন এলাকায়) একটি জামা'আত পাঠিয়েছিলেন। ঐ জামা'আতে বড় বড় অফিসার ও ডাক্তারগণ ছিলেন। জামা'আত যখন ফিরে আসল, মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কী বুঝলে? কাজের কী বুঝ পয়দা হলো তোমাদের? তারা জবাব দিলো, হযরত এই কাজ তো বহুত ভালো কাজ, আর আমাদের জামা'আতের মধ্যে অমুক সাথী আছেন, তিনি কাজ খুব ভালো বুঝেন। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, এই কাজ তো এখনও পর্যন্ত কেউই বুঝেনি।

অর্থাৎ তিনি নিজের ব্যাপারেও এ কথা বললেন যে, কেউই আজ পর্যন্ত এই কাজ যথাযথ বুঝে উঠতে পারেনি।

**তৃতীয় হযরতজীর তরয :**

موجودہ حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا میں کیا کہوں!

অর্থ: (আব্বাজান লিখেছেন,) 'আর বর্তমান হযরতজী (ইন'আমুল হাসান রহ.) তো বলেন যে, আমি তো কিছুই পারি না, আমি আর কী বয়ান করবো।'

দেখুন, এই ছিলো আমাদের এই মেহনতের বড়দের অবস্থা।

দাওয়াতের এই কাজ নবীওয়ালা কাজ। নবীদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাওয়াতের যিম্মাদারী দিয়েছেন। নবীরা উম্মতের মধ্যে সবসময় বিনীত হয়ে মেহনত করেছেন। কখনো তারা নিজেদের নবুওয়াতের দাবী অহঙ্কার-অহমিকার সাথে করেননি। আমাদের পূর্ববর্তী সকল আকাবিরের দাওয়াতী মেহনতেই নিজেকে মেটানোর, বিনয়ের সাথে চলার এই তরয বিদ্যমান ছিল। তারা নিজেকে নিস্তনাবুদ করেছেন, নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করেছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের মধ্যে নিজেদের কোন অস্তিত্ব, কোন হাইসিয়ত এবং নিজেদের জন্য কোন মাকাম আমাদের কোন আকাবিরই কায়েম করেননি। উক্ত তিন আকাবিরের পরে মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব ছিলেন। তাঁর সময়ও খুব অল্প ছিলো। তাঁকেও আল্লাহ তা'আলা পেয়ারা বানিয়ে নিয়েছেন। মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাবলীগের এই মুবারক মেহনতের মধ্যে এখন সৃষ্টি হয়েছে যত বিশৃঙ্খলা আর বিরোধিতা। যেসব সাথীর সাথে একসঙ্গে বসে খানা খাওয়া হতো, যাদের সাথে একসঙ্গে গাশত করা হতো, যাদের সাথে একসঙ্গে মাশওয়ারা করা হতো, যাদের সাথে একসঙ্গে সফরে যাওয়া হতো– মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. চলে যাওয়ার পরে এরা এখন পরস্পরে জানি-দুশমন হয়ে গেছে। কেন হলো এই অবস্থা?

মাওলানা সাদ সাহেবের ঐ সকল উস্তাদ, যারা নিযামুদ্দীন মারকাযে ষাট বছর পর্যন্ত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. ও মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেব রহ. -এর সোহবতে থেকে দাওয়াতের তাকাযাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছেন, ষাট বছর ধরে যারা এতো এতো কুরবানী পেশ করেছেন– মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর দেখা গেল, এই সব উস্তাদ কোন মাশওয়ারায় বসেছেন, আর কোন একটা বিষয় আলোচনায় উঠেছে, তো তিনি (মাওলানা সাদ সাহেব) এই মুরুব্বীদেরকে, তার উস্তাদদেরকে, ষাট বছরের কুরবানী দেনেওয়ালা বুযুর্গদেরকে বলছেন–

تم کیا جانو کام کو، کام تو میں لے کے چل رہا ہوں! اب میں جو کہونگا وہ ہوگا!

'তোমরা কাজের কী বুঝো, কাজ তো আমি নিয়ে চলছি! কাজেই আমি যা বলবো সেটাই হবে।'

হায়, হায়! কী ছিলো তিন বুযুর্গের কাজের তরয! কী ছিলো তাদের কর্মপদ্ধতি! আর কী ছিলো উম্মতের জন্য তাদের দরদ-ব্যথা! আর তারা নিজেদেরকে কিরকম ছোট করে উম্মতের সামনে পেশ হয়েছিলেন!

যখন থেকে বড়দের এই নূরানী তরয ও তরীকার বিপরীতে বুযুর্গদেরকে, উস্তাদদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা শুরু হল, নিজেই সবকিছু বুঝতে পারি, নিজেই সবকিছু চালাতে পারি এবং নিজেই সর্বেসর্বা মনোভাব চলে আসল তখন থেকেই তবলীগের মধ্যে সারা বিশ্বব্যাপী কাটাকাটি, মারামারি, হানাহানি।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. কাম করনেওয়ালা সাথীদেরকে শব্দে শব্দে একথা মুখস্থ করাতেন যে,

کہ کام کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے

অর্থাৎ কাম করনেওয়ালা যাত শুধু এবং শুধুই আল্লাহ। এ পর্যন্ত যা হয়েছে, সব আল্লাহই করেছেন। ভবিষ্যতে যা হবে, সব আল্লাহই করবেন।

এই সবক হযরতজী ইলয়াস রহ. কাম করনেওয়ালা সাথীদেরকে শব্দে শব্দে ইয়াদ করাতেন।

আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মাথার তাজ আকাবির উলামায়ে কেরাম তাবলীগের কাজের সারপারাস্তী (পৃষ্ঠপোষকতা) করতে এগিয়ে এসেছেন। তবলীগের কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশে এ কাজের মধ্যে ইনতিশার পয়দা হচ্ছে, এমনকি আলেম-উলামাদের উপর হাত উঠছে, তাদেরকে বে-ইজ্জত করা হচ্ছে– এসব বিষয় সামনে নিয়ে উলামায়ে কেরাম বড় দয়া করে, বড় মায়া করে, তাবলীগের কাজটাকে নিজের জানের চেয়েও বেশি মহব্বত করে কাজটাকে হেফাজত করার জন্য আগে বেড়ে এসেছেন। এটা শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহর ফযল, আল্লাহর করম এবং আল্লাহর খাস মেহেরবানী।

আপনারা শুনে খুশি হবেন, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. এবং হযরত মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেব রহ. যেভাবে ছোট হয়ে, আজেযীর সাথে, তাওয়াযুর সাথে, ইনকেসারীর সাথে তবলীগের কাজ চালিয়েছিলেন, তাঁদের ইমারতিতে যেরকম শান্তিপূর্ণভাবে তাবলীগের কাজ চলছিলো– নিযামুদ্দীনের ওই সমস্ত বর্তমান আকাবির, তাবলীগের ওই সমস্ত মুরুব্বী, যারা কিনা নিযামুদ্দীনের বর্তমান এই দুরাবস্থা বরদাশত করতে না পেরে যে, কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উম্মত গোমরাহীর দিকে চলে যাচ্ছে, কাজেরও হেফাজত করতে হবে, উম্মতকেও গোমরাহী থেকে বাঁচাতে হবে এজন্য আলাদা হয়ে গিয়েছেন– তাঁরাও ওই তিন আকাবিরের তরযে মেহনত শুরু করেছেন। জাহেরী আর বাতেনীভাবে তিন হযরতজী কাজের যে তরীকা রেখে গেছেন, যে তরীকায় মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. কেঁদে কেঁদে এই মেহনতকে কবুল করিয়েছেন, মেহনতের তরীকাকে কবুল করিয়েছেন– নিযামুদ্দীন থেকে আলাদা হওয়া এই হযরতগণও ওই তরীকায়, আলমী আন্দাযে সারা দুনিয়াতে মেহনত করছেন। আল্লাহর ফযল, আল্লাহর মেহেরবানী যে, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ, বেশিরভাগ মুলক তাঁদের সঙ্গেই জুড়ে গেছে।

কারগুযারী এসেছে– অল্প কিছুদিন আগে আমেরিকায় জোড় হয়েছে, ইউরোপে জোড় হয়েছে, আফ্রিকায় জোড় হয়েছে। কোন জায়গায় ৭০%, কোন জায়গায় ৮০%, কোন জায়গায় ৬০% কামকরনেওয়ালা নতুন-পুরাতন সাথী হযরত মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেবের বানানো শুরা যে তরযে কাজ করছে, ঐ শুরার সঙ্গে জুড়ে গেছেন। আর এই যে সারা বিশ্বে জোড় হচ্ছে, এই জোড়গুলোর মধ্যে এই শুরাদের উপস্থিতির কারণে আগে যে মজমা কখনও হয়নি, ধারণাতীতভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি মজমা শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহর মেহেরবানী, আল্লাহর ফযল ঘাবড়াবার কারণ নেই, দুশ্চিন্তার কারণ নেই ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু অতি সত্বর হালাত শুধরে দিবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ শুরায়ী নেযামের সাথে আল্লাহ তা'আলা সবার দিলকে জুড়ে দিবেন। আমরা সকলের কাছে দরখাস্ত করি, মাথার তাজ আলেম-উলামা তাশরীফ এনেছেন, তাঁরা আপনাদের সামনে যে প্রস্তাব রাখবেন, আপনারা সকলে ওই প্রস্তাব কবুল করে আলমী শুরার সঙ্গে মেহনত করবেন। আল্লাহ সবাইকে কবুল ফরমান! আমীন।

### মাওলানা আমান সাহেব দা.বা.

(খতীব, ভিক্টোরিয়া পার্ক জামে মসজিদ )

হামদ ও সালাতের পর...

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, দুঃখিত মনে আজকের এ মজমায় অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের জন্য এ মজমা খুব সুখকর বা আনন্দের নয়। কারণ, এটা আত্ম-সমালোচনামূলক মজমা। আমাদেরই কিছু দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে কিছু ভুল কথা, কিছু ভুল আলোচনা দাওয়াত ও তাবলীগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার কারণে আযীমুশ শান এ হেদায়াতী মেহনত আজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এটাকে কেন্দ্র করেই আজকের এ ওয়াযাহাতি জোড়। আমি আশা করি, যারা আকাবিরদের এ মজমা থেকে ইখলাসের সাথে কোন কথা গ্রহণ করতে চাইবেন, ইনশাআল্লাহ তারা জীবনের শেষ পর্যন্ত পথচলার রাহবরী পেয়ে যাবেন।

আমরা সবাই অবগত আছি, দাওয়াত ও তাবলীগের এ মেহনত আল্লাহর মেহেরবানীতে 'দিন দো-গুনী, রাত চৌগুনী' গতিতে এগিয়ে চলছিল। আরেকটু বাড়িয়ে যদি 'দিন চৌ-গুনী, রাত চৌ-গুনী' অর্থাৎ দিনে চারগুণ, রাতেও চারগুণ গতিতে এগিয়ে চলছিল বলা হয়, অতিরঞ্জন হবে না। এজন্য বাতিল, শয়তান ও ইসলামের দুশমনেরা বহু বছর যাবত বহুভাবে চেষ্টা করে আসছিল যে, বেগবান ও গতিশীল এ কাজটিকে কীভাবে বন্ধ করা যায়, নিদেনপক্ষে এর গতি সীমিত করে দেয়া যায়! কিন্তু এ কাজে আমাদের আকাবিরদের ইখলাস ও খোদাভীরুতার কারণে প্রায় একশত বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কাজটিকে হেফাজত করেছেন। কিন্তু কয়েক বছর যাবত বরং সঠিক করে বলতে হলে প্রায় বিশ বছর যাবত এ কাজের মধ্যে নানারকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বিশ বছর (১৯২৪-১৯৪৪) এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তার পরে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. প্রায় একুশ বছর (১৯৪৪-১৯৬৫) যিম্মাদারী পালন করেছেন। তার ইন্তিকালের পর হযরত মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ. মোটামুটি ত্রিশ বছর (১৯৬৫-১৯৯৫) এ যিম্মাদারী পালন করেছেন। এই সত্তুর বছর এই কাজের সোনালী যুগ। এই সত্তুর বছরে এ কাজের মুরুব্বীদের উপর কোনরূপ আপত্তি ওঠেনি। এরপর যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে কি কি আপত্তি উঠেছে ও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা পর্যায়ক্রমে উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে শুনবো। এগুলোর মধ্য থেকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, সেটা হল মাওলানা সাদ সাহেব কর্তৃক নিজেকে আমীর দাবী করা। মাওলানা সাদ সাহেবের এ দাবীটিই সমস্ত বিতর্ক ও ফেতনার মূল কারণ। কাজেই তিনি বাস্তবেই আমীর কিনা সেটা জানার জন্য আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে–

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. ইন্তিকালের পূর্বে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ., হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. ও হযরত মাওলানা যফর আহমদ থানবী রহ. প্রমুখের কাছে ছয়জন ব্যক্তির নাম পেশ করে বললেন, এই ছয়জনের প্রতি আমার আস্থা আছে, আপনারা এদের মধ্যে যাকে ভালো মনে হয়, আমার পরবর্তীতে দাওয়াতের কাজ সামলানোর জন্য আমীর নির্বাচন করে দিন। তারা পরামর্শক্রমে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-কে আমীর নির্বাচন করে দেন। হযরত ইউসুফ সাহেব রহ. ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের লাহোরস্থ বেলাল ময়দানে হার্ট অ্যাটাক করে ইন্তিকাল করেন। অবশ্য এ সম্পর্কে একটা মিথ্যা রটনা আছে যে, তাকে নাকি বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে। এটা একদম মিথ্যা কথা। বস্তুত তিনি হার্ট অ্যাটাক করে ইন্তিকাল করেছেন এবং এ ব্যাপারে একটি ঘটনাও আছে–

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. হার্ট অ্যাটাকের কিছুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরে পান, তখন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন, আমার কী হলো? ডাক্তার বললেন, তেমন কিছু না হযরত, সামান্য হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এ সময় মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. মাওলানা যাইনুল আবেদীন রহ.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার সাহেব এটা কী বলছেন, আমার নাকি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আরে, আমার তো হার্ট-

ই নেই। অর্থাৎ মেহনত করতে করতে হার্টটা তো আল্লাহকেই দিয়ে ফেলেছেন, কাজেই হার্টই যখন নেই, তাহলে অ্যাটাক হলো কোথায়? এ সময় মুফতী যাইনুল আবেদীন রহ. একটি উক্তি করেছিলেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বলেছিলেন, 'হযরত! ইয়ে ডাক্তার কিয়া জানতা হ্যায় দিল কি বাত! দিল তো জানতা হ্যায় দিল বানানেওয়ালা।' অর্থাৎ, ডাক্তার সাহেব হার্টের কী জানেন, হার্ট সম্পর্কে তো জানেন সেটার বানানেওয়ালা।

যাই হোক, মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর ইন্তিকাল হলো ১৯৬৫ সনের এপ্রিল মাসে। তাকে আমীর বানানোর সময় হযরতজী ইলিয়াস সাহেব রহ. নির্বাচকদের কাছে যে ছয়জন আস্থাভাজনের নাম লিখে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে যারা মাওলানা ইউসুফ সাহেবের ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন– হযরত যাকারিয়া রহ. তৎকালীন আকাবিরদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের মধ্য থেকে মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ.-কে আমীর নির্বাচন করলেন।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব এবং মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেব রহ. উভয়ে হযরত যাকারিয়া রহ.-এর বংশীয় আত্মীয় হওয়ার পাশাপাশি জামাতাও ছিলেন। এদিকে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর ইন্তিকালের সময় তার পুত্র মাওলানা হারুন সাহেব রহ. হায়াতে ছিলেন, যিনি হলেন মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহুর পিতা।

যাই হোক, মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেবকে আমীর বানানোর সময় কারো কারো দিলের তামান্না ছিল যে, আমীর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের পুত্র হারুন সাহেব হলে ভালো হয়। এ ব্যাপারে কিছুটা কানাঘুষাও ছিল যে, আমীর মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর খান্দান থেকে হলেই ভালো হয়। হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. যখন এ কানঘুষার কথা জানতে পারলেন, তিনি মাওলানা হারুন সাহেবকে ডেকে বললেন, মাওলানা হারুন! তুমি নিযামুদ্দীন বাংলাওয়ালী মসজিদে গিয়ে এই এলান করো যে, আমি (যাকারিয়া) উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে মাওলানা ইন'আমকে আমীর বানিয়েছি। মাওলানা হারুন সাহেব রহ.ও নানাজির কথামতো মারকাযে গিয়ে ফেতনাটাকে এই বলে ঠাণ্ডা করে দিলেন যে, নানাজান উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেই আমীর নির্বাচন করেছেন, আমিও বাই'আত হলাম, তোমরাও বাই'আত হয়ে যাও। যদি এই ব্যাপারটা, অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে আমীর বানানোর বিষয়টা মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেব রহ.-এর ইন্তিকালের পর হয়ে যেতো তাহলে আজকের এই ওয়াযাহাতি জোড়ের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু হযরতজী ইনআমুল হাসান রহ. আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তার ইন্তিকালের পর ব্যাপারটা এতো সহজ হবে না। এজন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিতও ছিলেন। ১৯৮২ সনে হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে কোনভাবে জানতে পারলেন যে, মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ. সব সময় পেরেশান থাকেন, মনমরা হয়ে থাকেন। তিনি হযরত ওমর পালনপুরী রহ.-কে এর কারণ উদ্ঘাটন করতে হুকুম দিলেন। হযরত ওমর পালনপুরী রহ. খোঁজ-খবর নিয়ে যাকারিয়া রহ.-কে জানালেন যে, ইন'আমুল হাসান রহ. তার ইন্তিকাল হয়ে গেলে এ কাজের যিম্মাদারী কে সামলাবেন এ নিয়ে চিন্তাবোধ করছেন। হযরত যাকারিয়া রহ. ওমর পালনপুরী রহ.-কে বললেন, 'মাওলানা ইন'আমুল হাসান যেন অনতিবিলম্বে একটা শুরার জামাআত বানিয়ে নেয়। এই জামাআতই এ কাজ পরিচালনা করবে।' অর্থাৎ তার বক্তব্যে এ ইঙ্গিত ছিল যে, ইন'আমুল হাসান রহ.-এর পর এ কাজের আর একক কোন যিম্মাদার থাকবে না। এ নির্দেশ পেয়ে হযরত ইন'আমুল হাসান রহ. ১৯৮২-৮৩ সাল থেকেই বিভিন্নভাবে শুরার জামাআত গঠনের চেষ্টা করতে থাকেন। অবশেষে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালে হজ্জের মওকায় তিনি মুফতী যাইনুল আবেদীন সাহেব রহ.-সহ কয়েকজন আকাবিরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার শারীরিক দুর্বলতা তো দেখতেই পাচ্ছো। এদিকে কাজেরও মাশাআল্লাহ খুব প্রচার-প্রসার হচ্ছে। আমি কাজের চাপে ভারাক্রান্ত। আমার ইচ্ছা, আমার পর তোমাদের একটা জামাআত এ কাজ সামাল দিক। সকলে সম্মতি প্রকাশ করলেন এবং সিদ্ধান্ত হল, হজ্জের পরপরই নিযামুদ্দীন গিয়ে এর সুরাহা করা হবে। সে সময় বিভিন্ন দেশের দীনী বড় বড় ব্যক্তিত্বের জন্য হিন্দুস্তানের ভিসা পাওয়া সহজ ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয় হল, হযরতদের ঐ জামাআতে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, যার ভাই তখন জেদ্দায় ভারতের হাইকমিশনার নিযুক্ত ছিলেন। হাইকমিশনার সাহেব খুব দ্রুত এই জামাআতের ভিসার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেমতে হজ্জের পর আগস্ট মাসে এ জামাআত নিযামুদ্দীনে জমায়েত হলেন। হযরত মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেব আটজনের নাম প্রস্তাব করলেন।

হিন্দুস্তান থেকে তিনজন–
(১) মাওলানা ওমর পালনপুরী সাহেব
(২) মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব
(৩) মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব
পাকিস্তান থেকে তিনজন–
(৪) মুফতী যাইনুল আবেদীন সাহেব
(৫) হাজী আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব
(৬) ভাই মুহাম্মদ আফযাল সাহেব
মদীনা মুনাওয়ারা থেকে একজন–
(৭) মুফতী সাঈদ আহমদ খান সাহেব
(ইনি মূলত পাকিস্তানী ছিলেন, পরবর্তীতে মুহাজিরে মাদানী হয়েছেন।)
বাংলাদেশ থেকে একজন–
(৮) ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মুকীত সাহেব

এই আটজনের নাম উল্লেখ করে তিনি বললেন, তোমরা এই আটজন আমার শুরা। শেষে বললেন, 'ইয়ে দোনো কো ভি শামিল কারলো' –এ দুজনকেও অন্তর্ভুক্ত করে নাও। হযরতজী ইন'আমুল হাসান রহ. বিশেষ কোন হেকমতের কারণে–
(৯) মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহ. ও
(১০) মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ-কেও শুরায় অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। এর ফলে হিন্দুস্তান থেকে এ শুরায় পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত হলেন।

শুরা গঠিত হওয়ার পর একবৈঠকে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. শুরার সব সদস্যের উপস্থিতিতে হযরতজীকে প্রশ্ন করেন, 'হযরত! আপনি যখন যেখানে উপস্থিত থাকবেন, আপনিই আমীর। কোথাও যদি আপনি উপস্থিত না থাকেন তখন সেখানে এই মেহনত কীভাবে চলবে?

উত্তরে হযরতজী বললেন, 'তুম সব, ইয়া জিতনে ভি মওজুদ হো, আপনে মে সে এক কো ফায়সাল বানা-কার কাম কারো।' (তোমরা সবাই অথবা যতজনই উপস্থিত থাকবে, নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ফয়সাল অর্থাৎ সিদ্ধান্তদাতা বানিয়ে কাজ করবে।)

১৯৯৫ সালে হযরতজী ইনআমুল হাসান রহ. শুরার এই জামাআতকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এ হজ্জের সফরেই শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত আট-দশটি রাষ্ট্র সফরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। হজ্জ শেষে এ বছরই ১০ই মুহাররম আশুরার দিবাগত রাতে নিযামুদ্দীনে হযরতজী ইন্তিকাল করেন। এ সময় আমি (আমান) নিযামুদ্দীন মারকায মাদরাসার ছাত্র হিসেবে হযরতজীর শেষ মাশওয়ারায় উপস্থিত ছিলাম। ইন্তিকালের কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও আমি হযরতজীকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

যাই হোক, হযরতজীর ইন্তিকালের পর এই শুরার সদস্যগণ মাশওয়ারায় বসলেন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন পর্যন্ত তারা

মাশওয়ারায় বসলেন। তৃতীয় দিন মাশওয়ারার ফায়সাল ছিলেন, মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহ.। মাশওয়ারার একপর্যায়ে আমীর বানানোর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে মাওলানা সাদ সাহেব বললেন, 'মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেবকে আমীর বানানো হলে ঐসব সাথী নিজেদেরকে সরিয়ে নেবে যারা আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। আর আমাকে আমীর বানানো হলে ঐসব সাথী নিজেদেরকে এই মেহনত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে যারা মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন। কাজেই আমি মনে করি, এখানে কোন আমীরই না থাক। মেহনত শুরার অধীনে পরিচালিত হবে। আর নিযামুদ্দীনে কোন ধরণের বাইআত হবে না।' অতঃপর শুরার সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফায়সাল হিসেবে মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহ. বাংলাওয়ালী মসজিদে সিদ্ধান্তগুলো সেগুলো পড়ে শোনান। মজার বিষয় হলো, মিয়াজী মেহরাব সাহেব ফায়াসালা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু রায়গুলো ছিলো মাওলানা সাদ সাহেবের।

সিদ্ধান্ত তিনটি এই–

(ক) এখন থেকে এ মেহনতের যিম্মাদারী কোন এক আমীরের ওপর বর্তাবে না; বরং পুরো শুরার ওপর বর্তাবে। অর্থাৎ এ কাজের একক কোন আমীর থাকবে না।

(খ) এই শুরার মাঝে বাংলাওয়ালী মসজিদের যে সকল হযরতগণ (পাঁচজন) আছেন, তারার নিযামুদ্দীনের শুরা বিবেচিত হবেন। এরা আগামীতে নিযামুদ্দীনের মেহনত এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এর পাশাপাশি নিযামুদ্দীনের যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই পাঁচজনের মধ্য হতে এই তিনজন পালাবদল করে ফায়সাল হবেন– মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব, মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব এবং মাওলানা সাদ সাহেব।

(অবশ্য একবছরের মাথায় শুরার সর্বসম্মতিক্রমে নিযামুদ্দীনের বাকি দু'জনকেও পালাক্রমে ফায়সাল নির্ধারণ করা হয়।)

(গ) এখন থেকে নিযামুদ্দীনে বাইআত স্থগিত থাকবে।

এই সিদ্ধান্তসমূহের লিখিত কপি এবং এর ওপর শুরার দশ সদস্যের প্রত্যেকের স্বাক্ষর এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

এ সিদ্ধান্ত অনুসারেই এই হযরতগণ দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কুদরতের কি শান, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই আলমী শুরার অধিকাংশ সদস্য ইন্তিকাল করেন।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেব ইন্তিকাল করেন। ১৯৯৭ সালের মে মাসে মাওলানা উমর পালনপুরী সাহেব, ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে মিয়াজী মেহরাব সাহেব এবং এ বছরই নভেম্বর মাসে মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব ইন্তিকাল করেন। এ পর্যায়ে নিযামুদ্দীনের পাঁচ রোকনবিশিষ্ট শুরার মাত্র দুই সদস্য জীবিত থাকেন। এ সময় থেকেই শুরু হয় একক আমীরের প্রচারণা, মাশওয়ারাবিহীন চলা, বিতর্কিত নতুন নতুন আলোচনা, অদ্ভুত সব ইজতিহাদ আর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ।

এরপর ১৯৯৮ সালে এই শুরার নেতৃত্বে আফ্রিকার ৯টি দেশে সফর হয়। এই সফরে মরিশাসের তাবলীগী মারকায় সেন্ট লুইসে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,

'কোন নতুন বিষয় বা পরিবর্তন আলমী শুরার মাশওয়ারা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যাবে না। মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো তো দূরের কথা, অপ্রসিদ্ধ সহীহ কথাগুলোও সর্বসাধারণের মজমায় বয়ান করা যাবে না। যেন কোন ধরণের ভুল বোঝাবুঝি–যা মেহনতের ক্ষতির কারণ হযে দাঁড়াতে পারে–তা যেন সাধারণ মানুষের মাঝে সৃষ্টি না হয়।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! আগের মতোই চলতে থাকে নিজস্ব ইজতিহাদ।

তারপর ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব ইন্তিকাল করেন। এ পর্যায়ে আলমী শুরার মাত্র পাঁচজন সদস্য জীবিত থাকেন। এরপর ২০০৪ সালের মে মাসে মুফতী যাইনুল আবেদীন সাহেব এবং ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে ভাই আফযাল সাহেবও ইন্তিকাল করেন।

১৯৯৯ সালে রায়বেন্ড ইজতিমার পর উদ্ভুত জটিলতা আমলে নিয়ে হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের পুরানা সাথীদের উদ্দেশে একটি বিশ্লেষণমূলক পারচা তৈরী করা হয়। এ পারচায় সে সময়ে জীবিত পাঁচ শুরা সদস্যের প্রত্যেকের স্বাক্ষর রয়েছে। সে পারচার শেষ অনুচ্ছেদটি ছিল,

'তদ্রুপ রায়বেন্ড ও নিযামুদ্দীনেও কোন নতুন বিষয় শুরু করার পূর্বে হযরতজী রহ. কর্তৃক গঠিত পুরো শুরার একমত হওয়া জরুরী।'

আর এটা কোন নতুন বিষয় ছিল না। তাবলীগের ছোট থেকে ছোট কাজও হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. পরামর্শ ছাড়া করতেন না। এমনকি তিনি নিজের ভাতিজা এবং নিজের তরবিয়তে লালিত হযরত যাকারিয়া রহ.-এর সঙ্গেও পরামর্শ করতেন, তাকেও জিজ্ঞেস করে করে কাজ করতেন।

যাই হোক, ১৯৯৮-৯৯ সনের পর থেকে নিযামুদ্দীন মারকাযে ধীরে ধীরে একজন ব্যক্তি অর্থাৎ মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ তার ব্যক্তিগত বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আপন উস্তাদ, আকাবিরীন ও শুরা কারও পরামর্শই মানতে পারলেন না। আমার মতে তার সে সীমাবদ্ধতাগুলো হলো– তিনি ছোটবেলা থেকেই 'সাহেবযাদা'-র মর্যাদা পেয়ে এসেছেন। তাবলীগের সহজতার যামানায় তিনি তাবলীগে এসেছেন। তিনি আকাবিরদের যিন্দেগীতে ঘটিত মসজিদ থেকে বিতাড়িত হওয়া, মারপিট ও গালমন্দ হজম করার মতো কুরবানীর সম্মুখীন হননি। উপরন্তু পূর্ববর্তী আকাবির হযরতগণ যেমন তাদের বড় ও বুযুর্গদের দীর্ঘ সোহবত হাসিল করেছেন তেমনটি তার নসীব হয়নি। এটি একান্তই আমার ব্যক্তিগত মত যে, হয়তো আভ্যন্তরীণ এসব কারণেই তিনি বড়দেরকে মানতে পারলেন না। তিনি মাশওয়ার খেলাফ কাজ করতে শুরু করলেন। অসতর্ক ও লাইনচ্যুত বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। আমাদের বড়রা দীর্ঘদিন ধরে তাকে এসব ব্যাপারে বুঝালেন, সতর্ক করলেন। কখনো বন্ধ কামরায়, কখনো আলোচনার মাধ্যমে, কখনো চিঠি-পত্রের মাধ্যমে বুঝাতে থাকলেন। হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেব রহ., মাওলানা ইবরাহীম দেউলা সাহেব দা.বা., মাওলানা আহমদ লাট সাহেব দা.বা., মাওলানা যাহেদ মাযাহেরী সাহেব ও মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী সাহেব প্রমুখ মুরুব্বীর প্রেরিত চিঠিপত্র এখন কিতাব আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। এসব আলোচনা ও চিঠিপত্র দ্বারাও যখন কোন কাজ হলো না, উল্টো তিনি এসব চিঠির অদ্ভুত সব জওয়াব দিলেন তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া বড়দের সামনে আর কোন পথ রইল না। কারণ, এতবড় মুবারক মেহনত মাত্র একজন ব্যক্তির জেদের কারণে নষ্ট হতে দেয়ার কোন মানে হয় না।

যাই হোক, ২০১৫ সনের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রায়বেন্ডের ইজতিমায় নিযামুদ্দীনের আকাবির হযরতসহ সারা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শুরা হযরতগণের রায়ের ভিত্তিতে পূর্বের আলমী শুরার জীবিত দুইজন (ভাই আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব ও মাওলানা সাদ সাহেব)-এর সঙ্গে আরও ১১জনকে মিলিয়ে মোট ১৩ জনের একটি আলমী শুরা বানানো হল।

রায়বেন্ড ইজতিমা থেকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে কেউ কেউ এই শুরাকে 'পাকিস্তানী শুরা' বলে কটূক্তি করেন। আসল ব্যাপার হল, বহু আগে থেকেই ইজতিমায়ী মাশওয়ারার জন্য তিনটি স্থান নির্ধারিত ছিল– হজ্জ, টঙ্গী ও রায়বেন্ড। পালাক্রমে এসময় মাশওয়ার স্থান পড়ে গেছে রায়বেন্ড। এর বেশি কিছু নয়। আমার তো

মনে হয়, আলেমরা যদি আল্লাহর কাছে বলেন, ইয়া আল্লাহ! আমাদের এই ভাইয়েরা তো দুনিয়ার কাউকেই মানছে না, আপনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে তাদেরকে একটু বোঝানোর ব্যবস্থা করুন, তখনও এই ভাইয়েরা এই বলে আপত্তি করবেন যে, ইনি তো আগের জিবরাঈল নন, ইনি তো পাকিস্তানী!!! আল্লাহ মাফ করুন, যে কোন বিষয়েই তারা এখন পাকিস্তানী খোঁজা শুরু করে দিয়েছে।

তো ঐ ১৩জনের মধ্যে হিন্দুস্তান থেকে পাঁচজন, পাকিস্তান থেকে পাঁচজন আর বাংলাদেশ থেকে তিনজনকে নির্বাচন করা হল। কিন্তু এই শুরাকে নির্বাচিত ১৩জনের মধ্য থেকে ২জন মেনে নিতে পারলেন না। একজন মাওলানা সাদ সাহেব, আর অপরজন বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য ভাই ওয়াসিফ সাহেব। এই দু'জন সেই শুরা না মেনে পরবর্তীতে কী কী করলেন, তা বলার প্রয়োজন নেই, আমাদের সবারই তা জানা আছে।

এ পরিস্থিতিতে সাধারণ সাথীদের পক্ষ হতে উলামায়ে কেরামের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, আমরা আমাদের কথাবার্তায় দাওয়াত ও তাবলীগের সকল সাথীকে জড়িয়ে আঘাত না করি। কারণ, এমন লক্ষ লক্ষ সাথী আছেন, যারা আমাদের উলামায়ে কেরামের কথায় দীনের জন্য জান কুরবান করতেও প্রস্তুত আছেন। সুতরাং কাউকে দমন করতে গিয়ে আমরা এসব কুরবানীওয়ালা সাথীদেরকেও আহত না করি।

আর আলেম নন এমন সাথীদের প্রতি আমার অনুরোধ, আলমী শুরার ঐ ১১জন যেদিকে আছেন এবং যাদের মাশওয়ারায় এখন পুরো বিশ্বে জোড়, ইজতিমা চলছে আমরা তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে দাওয়াতের কাজ করতে থাকবো ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন।

### মুফতী কিফায়াতুল্লাহ আযহারী সাহেব দা. বা.

আজকের এই ওয়াযাহাতি জোড়ে আমাদের এ দেশের আকাবির উলামায়ে কেরাম ও সমগ্র বাংলার উলামায়ে কেরামের রাহবার শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী দা. বা. উপস্থিত আছেন। আজকে আমাদের মুরুব্বিয়ানে কেরামের পক্ষ থেকে তাবলীগের এ কাজ ভবিষ্যতে কিভাবে চলবে, এ কাজের হেফাজত কিভাবে হবে তার লিখিত বরং মৌখিক ইজতেমায়ী সিদ্ধান্ত (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ, আমরা সকলেই সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাওয়াতের এ মহান কাজকে নিয়ে চলবো এবং মেহনত করবো। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

### মাওলানা মাসউদুল কারীম সাহেব দা.বা.

বড়দের নির্দেশে আমি দু'টি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এক. হযরত মাওলানা সাদ সাহেব বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের আকাবির, আসলাফ ও আহলে সুন্নাহ-এর মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। এটি অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের পথ-পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামের সীরাত থেকে গ্রহণ করার শ্লোগান তুলে নিজের মনমতো সীরাতে সাহাবার অপব্যাখ্যা করে এক নতুন ফর্মুলা দাঁড় করিয়েছেন। এটা অতীতের তিন হযরতজীর কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলে হাদীস ফিরকা যেমন দীনকে সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে গ্রহণ করার শ্লোগান তুলে উম্মতকে আকাবির-আসলাফদের পথ থেকে বিচ্যুত করার চক্রান্ত করছে, ঠিক তেমনি মাওলানা সাদ সাহেবও জেনে বা না জেনে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উম্মতকে আকাবির-আসলাফের পথ থেকে বিচ্যুত করছেন।

দুই. আজকে দাওয়াত ও তাবলীগের কিছু ভাই একজন ব্যক্তি মাওলানা সাদ সাহেবের এবং একটি মারকায নিযামুদ্দীনের আনুগত্যের দাওয়াত দিচ্ছেন। কোন দাওয়াত বা সংগঠনের মারকায ঐ মেহনতের নযরিয়া (দৃষ্টিভঙ্গি) ও ফিকিরকে (চিন্তা-চেতনা)- কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়। নযরিয়া ও ফিকির ছাড়া শুধু ইট-পাথরের দালান- প্রাসাদ মারকাযের মর্যাদা পেতে পারে না। তদ্রুপ কাউকে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করতে শর্ত হলো, যে মেহনতকে কেন্দ্র করে ঐ ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সেই মেহনতের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক লালনও তাকে করতে হবে। অন্যথায় ঐ ব্যক্তি কিছুতেই ঐ মেহনতের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হতে পারে না। বর্তমানে নিযামুদ্দীন ও সাদ সাহেব কেউই দাওয়াতের মেহনতের সঠিক নযরিয়া ও ফিকিরের ওপর নেই, কাজেই এ দু'টো এখন আর কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তির মর্যাদা পাবে না।

### মুফতী ইনআমুল হক সাহেব দা.বা., বসুন্ধরা

মুহতারাম হাযেরীন! আজকে ব্যাপকভাবে একটি কথা শোন যায় যে, শত বছর ধরে চলে আসা তাবলীগ নিয়ে হঠাৎ কেন উলামায়ে কেরামের এত মাথাব্যথা? তারা কেন এটা নিয়ে নাক গলাচ্ছেন? দেখুন, উলামায়ে কেরামকে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল বিশেষ এক যিম্মাদারী অর্পণ করেছেন। সেটা হল, কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহর কোন বিধানে যে বা যারাই গুলু (অতিরঞ্জন) করবে, তাহরীফ (বিকৃতি সাধন) করবে, অপব্যাখ্যা করবে তাদেরকে প্রতিরোধ করা এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যখ্যা মুসলমানদের সামনে সুস্পষ্ট করা। এটা নবীজীর পক্ষ হতে উলামায়ে কেরামের প্রতি অর্পিত এক মহান যিম্মাদারী।

মাওলানা সাদ সাহেব যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর বহু সুস্পষ্ট ও মীমাংসিত বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর খেলাফ মতামত প্রচার করছেন, কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন তখন নবীজীর পক্ষ হতে এগুলো প্রতিরোধের যিম্মাদার উলামায়ে কেরাম তো চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। যতদিন এ মেহনত ঠিকঠাক চলছিল, ততদিন উলামায়ে কেরাম সমর্থন করে গেছেন, দু'আ করেছেন, সাধ্যমতো মেহনতেও শরীক হয়েছেন। আর যখন থেকে ভুল ও বিচ্যুতি মাত্রা ছাড়িয়েছে, জনসাধারণ ভুলবার্তা পাচ্ছে এবং সংশোধনের ব্যক্তিগত বহু উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, ব্যস উলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছেন।

### হযরত মাওলানা তৈয়্যব সাহেব দা.বা.

হক্কানী রাব্বানী উলামা-মাশায়েখ ও পীর-বুযুর্গগণ বহু দুঃখ-বেদনা নিয়ে এখানে তাশরীফ এনেছেন। এত বড় একটি মকবুল জামাআত প্রায় একশত বছর পর্যন্ত এই হেদায়াতী কাজ হযরত মাও. ইলিয়াছ রহ.-এর মেহনত, এখলাছ, লিল্লাহিয়্যাত ও খুলূছিয়্যাতের বরকতে নীরবে-নিভৃতে সারা বিশ্বে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এখানে কে আগে বয়ান করলো, কে পরে করলো এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। এই মেহনত করতে গিয়ে কেউ মার খেলো, গালি খেলো, কোন প্রতিবাদ নেই। আমরা ইজতিমায় গিয়ে দেখেছি, সবার ভেতরে সংশোধন ও ইসলাহের ফিকির– ভাই যার যার ডানে চলি, যিকিরে ফিকিরে চলি। পক্ষান্তরে এখন কী হচ্ছে? তাবলীগের সব কাজ বাদ দিয়ে শুধু সাদ আর গায়রে সাদ। এগুলো শোনার জন্য আমরা এখানে আসিনি। আমি এখানে আসার আগে আমাদের সবার মুরুব্বী, আল্লাহর ওলী, হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম শাইখুল ইসলাম আহমাদ শফী মাদ্দাযিল্লাহুল আলীর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাত করেছি। আমি হযরতকে জিজ্ঞেস করেছি যে, হুযূর! আমরা তো এতদিন বিলকুল চুপচাপ ছিলাম; এসব নিয়ে কখনও কথা বলিনি। কিন্তু এখন যে আমরা জোড় করতে এসেছি, তো আমি এখানে কী বলব? হযরত বললেন, 'বেশী কথা বলার দরকার নেই, সবাই মিলে আমরা দেওবন্দের

ফতওয়া মানি। সবাই যদি দেওবন্দের ফতওয়া মানি তাহলে সবাই আমরা ভাইভাই।' মনে রাখতে হবে, উলামায়ে কেরাম তাবলীগী কাজে সর্দারী করতে আসেননি। তারা ইসলাহ ও সংশোধন করতে এসেছেন। উলামাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ সর্দারী করার হাজার হাজার মওকা আছে। উলামায়ে কেরাম ইসলাহ না করলে তো ইসলামের তাবলীগ হবে না, হবে সাদ সাহেবের তাবলীগ।

খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক সাহেব রহ. দারুণ একটা কথা বলতেন– ঝোল যে মজা হয়, সেটা কি ঝোলের নিজস্ব গুণে, না গোশতের বরকতে? আপনারা শুনেছেন কখনো, গোশত ছাড়া এমনি-এমনি ঝোল মজা হয়ে গেছে? মনে রাখতে হবে, উলামায়ে কেরাম হলেন তাবলীগী কাজের গোশত, আর এর যে উপকারিতা ও বরকত পরিলক্ষিত হচ্ছে তা উলামায়ে কেরামেরই কুরবানীর বরকত।

উলামায়ে কেরামের এখলাছ, লিল্লাহিয়্যাত ও ফানাইয়্যাত দেখুন– হযরত মাওলানা. ইলিয়াস রহ. আল্লাহর প্রতি খুব মুতাওয়াজ্জেহ ছিলেন। তার অন্তরের তাওয়াজ্জুহও খুব জোরদার ছিল। কোন এক কিতাবে পড়েছি– একবার নিযামুদ্দীনে হযরতজী ইলিয়াস রহ. বয়ান করছিলেন। এমন সময় হযরত মাদানী রহ.-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরতজী ইলিয়াস রহ. মজমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি তো সবসময় দু'-চারটা সাদামাটা কথা বলি, এই হযরত (মাদানী) এখন আপনাদেরকে অনেক দামী দামী কথা বলবেন।'

দেখুন, হযরতজী ইলিয়াস রহ. কেমন ফানা ছিলেন। তিনি কখনও নিজেকে কাবেল মনে করেননি। এজন্য আল্লাহ পাকও তাকে ভরপুর মকবুল বানিয়েছেন। কাবেলিয়্যাতের (যোগ্যতা) দরকার নেই, মাকবুলিয়্যাত দরকার। অতঃপর হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. কথা সংক্ষিপ্ত করে বসে গেলেন। কিতাবে লিখেছে, হযরত মাদানী রহ. চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ বয়ান করে মজমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার ভাই মাওলানা ইলিয়াস সাহেব আপনাদেরকে ইংরেজদের ব্যাপারে কিছু বয়ান করবেন। ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে তাড়াতে হবে। একথা শোনে হযরত ইলিয়াস রহ. বললেন, হযরত! এটা তো আপনার কাজ। আমার যা বলার তা-তো আগেই বলে দিয়েছি। অগত্যা হযরত মাদানী রহ. এরপর ৩৫ মিনিট বয়ান করেছেন। এই ৩৫ মিনিটের বয়ানে তিনি শুধু তাবলীগের ফাজাইল বর্ণনা করেছেন, ইংরেজ তাড়ানোর ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। বয়ান শেষে হযরত মাদনী রহ. হযরত ইলিয়াস রহ.-কে বললেন, আমি তো আমার আলোচ্য বিষয় ভুলে গেছি। বলতে চেয়েছিলাম ইংরেজ তাড়ানোর কথা, বলে দিয়েছি তাবলীগের ফাযাইল! হযরত ইলিয়াস রহ. বললেন, হযরত! এটা আমার দিলের দু'আ ছিল। এ ঘটনা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, যে নিজেকে ফানা করে, মিটিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে সারা দুনিয়ায় চমকিয়ে দেন। পক্ষান্তরে আমরা নিজেকে কাবেল মনে করি, যোগ্য মনে করি। আল্লাহর কাছে এর কোনই দাম নেই।

কোথাও গেলে মানুষ আমাদেরকে প্রশ্ন করে– উলামায়ে কেরাম কেন আমাদের তাবলীগী ভাইদের সাথে তর্কে জড়ায়? দেওবন্দ কেন ফতওয়া দিতে গেল? আমি তাদেরকে বলি, উলামায়ে কেরাম তর্কে না জড়িয়ে থাকবে কিভাবে, মানুষের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে দেয়া তো তাদের কাজ। আর তাবলীগ তো দেওবন্দ থেকেই বের হয়েছে। এটা কেমন কথা যে, আমার ছেলে দুষ্টামি করবে, আর আমি তাকে সংশোধনও করে দিবো না? উলামায়ে দেওবন্দও সেই সংশোধনের কাজটি করছেন। দেওবন্দ মাদরাসা থেকে যে ফতওয়া দেয়া হয়েছে, এটা শতভাগ বাস্তব ফতওয়া। এই ফতওয়া যদি মানা হয় তাহলে সমস্যাটি পুরোপুরি মিটে যাবে। অন্যথায় সমস্যা তো মিটবেই না, উল্টো হানাহানি শুরু হবে। আল্লাহ সবাইকে বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেব দা.বা., লালবাগ**

মুহতারাম উপস্থিতি! এই মজমায় শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী দা. বা. উপস্থিত আছেন। দেশের শীর্ষ উলামায়ে কেরাম উপস্থিত আছেন। আমি সকলের কাছে জানতে চাই, এই মজমা থেকে চলমান সমস্যার ব্যাপারে ইজমা তথা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত আসতে পারে কিনা? ইনশাআল্লাহ, আমাদের হযরতগণ এ বিষয়ে আজকে যে ইজমায়ী সিদ্ধান্ত দিবেন এবং আমরা সকলে তার উপর আমল করবো।

**হযরত মাও. আব্দুল আউয়াল সাহেব দা.বা.**

সারা বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আল্লাহ পাকের শোকর, বাংলাদেশে উলামায়ে কেরাম ও বেশিরভাগ তাবলীগী ভাইয়েরা জুড়েমিলে কাজ করার কারণে বাংলার জমিনে এখনো খ্রিস্টান মিশনারী ও ইয়াহুদীরা পুরোপুরি সফল হচ্ছে না। এজন্য তারা তাদের প্ল্যানগুলো বাস্তবায়ন করতে উলামায়ে কেরাম থেকে জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। যেহেতু এটা করা গেলে জাতিকে সহজেই পথভ্রষ্ট করা যাবে, এজন্য তারা খুব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ কাজে তারা উলামায়ে কেরামের বেধড়ক বদনাম ও সমালোচনা করতে পারে এমন কিছু লোককে ব্যবহার করছে। উলামায়ে কেরামের বদনাম করতে পারলে, মানুষ তাদেরকে খারাপ জানলে ধীরে ধীরে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। এভাবে রাখালবিহিন জাতিকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলছি– আল্লাহ পাক তার কুরআন মাজীদে নিজে উলামায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন, হাদীসে পাকে নবীজীও তাদের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং আমরা যদি ঈমান নিয়ে কবর পর্যন্ত যেতে চাই, দীনের সত্যিকার দায়ী বনতে চাই তাহলে উলামায়ে কেরামকে গালি দেয়া, তাদেরকে মন্দ বলা পরিহার করি। উলামায়ে কেরামকে কটাক্ষ করে, তাদেরকে গালিগালাজ করে কোনদিন আমরা মঞ্জিলে মাকসাদে পৌঁছতে পারব না।

দীনী ভাইয়েরা, দায়ী ভাইয়েরা! আপনাদেরকে হাতে-পায়ে ধরে আরেকটি অনুরোধ করছি–

আপনারা 'নিযামুদ্দীনের এতাআত' কথাটা পরিহার করুন। 'হকের ওপর থাকুক আর নাহকের ওপর থাকুক সর্বাবস্থায় নিযামুদ্দীনের এতাআত করব'– এটা কোন মুমিনের কথা হতে পারে না। উলামায়ে কেরাম, যাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের এর পক্ষ হতে উম্মতের দেখভালের যিম্মাদারী দেয়া হয়েছে আপনারা তাদের এতায়াত করুন। এই উম্মত যতদিন পর্যন্ত উলামায়ে কেরামকে সামনে রাখতে পারবে ততদিন সহীহ হেদায়েতের ওপর থাকতে পারবে। কেউ যদি উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীনের কোন কাজ করতে চায় তাহলে সে কাজ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হবে না ব্যক্তিগত গরয পুরা করার জন্য হবে। আর এমন কাজের মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা কারও পক্ষে কোনদিনও সম্ভব হবে না।

**অনুলিখন :**
**মাওলানা আব্দুল হান্নান,**
**মাওলানা মাহমুদুল হাসান কুমিল্লা,**
**মাওলানা ইবরাহীম রহমত।**

**পরিমার্জন :**
**মাওলানা আবূ সাইম,**
**মাওলানা সা'দ আরাফাত।**

# মুহাম্মদপুরের ওয়াযাহাতি জোড়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

১. জমহুর উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন, তিনটি মৌলিক কারণে-

(ক) কুরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা।

(খ) তাবলীগের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তাবলীগ ব্যতীত দীনের অন্যান্য মেহনতকে যথা দীনিশিক্ষা ও তাসাওউফ ইত্যাদিকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

(গ) পূর্ববর্তী তিন হযরতজী (হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.)-এর উসুল ও কর্মপন্থা থেকে সরে যাওয়ার কারণে বর্তমানে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবকে অনুসরণ করা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ।

২. মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.-এর রেখে যাওয়া শুরায়ী নেযামকে উপক্ষো করে নিজেই নিজেকে আমীর দাবী করেছেন; যা শরীয়ত বিরোধী। তাই তার কোনোরূপ সিদ্ধান্ত-ফয়সালা বা নির্দেশ কাকরাইল তথা বাংলাদেশে বাস্তবায়িত করা যাবে না।

৩. দারুল উলূম দেওবন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শ থেকে সরে গিয়ে নতুন কোনো ফেরকা গঠনের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কোনো জামাআত বা ব্যক্তিকে নিযামুদ্দীনে পাঠানো বা যাওয়া মুনাসিব হবে না।

অনুরূপভাবে নিযামুদ্দীন থেকে আগত কোনো জামাআতকে বাংলাদেশের কোনো জেলায়/থানায়/ইউনিয়নে কাজ করার সুযোগ দেয়া যাবে না।

৪. হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. এর বাতানো পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সারা দুনিয়াতে সমাদৃত ও গৃহীত হয়েছে।

তাই বাংলাদেশের তাবলীগের কাজ পূর্ববর্তী এই তিন হযরতের পদ্ধতিতে এবং উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। নতুন কোনো পদ্ধতি চালু করা যাবে না। কাকরাইল, টঙ্গী ময়দান এবং জেলা মারকাযসহ সকল মারকায এই নীতিতেই পরিচালিত হবে।

৫. কাকরাইল মসজিদের যে সমস্ত শুরা সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের ভ্রান্ত আকীদা অনুসরণের আমরণ হলফনামা করেছেন– যা শরীয়ত পরিপন্থী– তারা শুরার সদস্য থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। অতএব, তাদেরকে বাংলাদেশের তাবলীগের কাজে শুরা ও ফায়সাল না রাখার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

৬. ২০১৮-এর টঙ্গী ইজতিমায় সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে আগামী ২০১৯-এর টঙ্গী ইজতিমার জন্য নির্ধারিত তারিখ- প্রথম পর্ব ১৮, ১৯, ২০ জানুয়ারি ও দ্বিতীয় পর্ব ২৫, ২৬, ২৭ জানুয়ারির সাথে আজকের মজমা ঐকমত্য পোষণ করছে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে এবং বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা রোধে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

গ্রন্থ পরিচিতি

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. লিখিত

# খ্রিস্টধর্ম : কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা

**মাওলানা মাহমূদুল হাসান**

বাংলাদেশের যে সকল বরেণ্য আলেমেদীন জনসমাজে দীনী জাগরণ ও ঈমান-আমল সংরক্ষণের নিমিত্তে মূল্যবান কিতাবাদি ও পুস্তক-পুস্তিকা সংকলন করছেন শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম তাদের অন্যতম।

হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের সংকলিত অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থের মতই আরো একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম, **খ্রিস্টধর্ম : কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা।**

গ্রন্থটি রচিত হয়েছে মূলত দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে–

এক. খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রতারণা ও ধোঁকা থেকে মুসলিম ভাই-বোনদের ঈমান ও আমলের সংরক্ষণ।

দুই. অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও প্রতারণা থেকে বেরিয়ে আসতে বর্তমান খ্রিস্টসমাজকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন।

বর্তমানে সরলমনা মুসলিমদেরকে খ্রিস্টান মিশনারীরা এ বলে ধোঁকা দিচ্ছে যে,

*# প্রচলিত খ্রিস্টবাদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত দীন ও শরীয়ত!*

*# তাদের প্রচারিত কিতাবুল মোকাদ্দাস বা বাইবেল হলো আল্লাহর নাযিলকৃত আসমানীগ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল।*

*# হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত ঈসায়ী ধর্ম সার্বজনীন তথা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য পালনীয় ধর্ম।*

*# হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী নন; বরং শেষ নবী হলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম।*

তাদের এসব ধোঁকা থেকে বাঁচতে **'খ্রিস্টধর্ম : কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা'** গ্রন্থে মুহতারাম লেখক খ্রিস্টধর্মের নিম্নলিখিত মৌলিক ছয়টি বিষয়ে কুরআন-হাদীস, প্রচলিত বাইবেল, ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে অত্যন্ত সারগর্ভ ও প্রামাণ্য আলোচনা পেশ করেছেন :

১. খ্রিস্টধর্মে অনুসরণীয় কে, যীশু খ্রিস্ট, নাকি সেন্ট পল?
২. বাইবেল আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল, নাকি সেন্ট পলের ধর্মগ্রন্থ?
৩. খ্রিস্টধর্মমতে স্রষ্টা একজন, নাকি তিনজন?
৪. খ্রিস্টধর্মমতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অন্তর্ধান : ক্রুশে হত্যা করা হয়েছে, নাকি সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে?
৫. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত সার্বজনীন, নাকি তা কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য?
৬. শেষ নবী কে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

প্রথম বিষয়টির পর্যালোচনায় লেখক প্রমাণ করেছেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অন্তর্ধানের কিছুকাল পরেই তাঁর তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্মকে ইয়াহুদী মোনাফেক সেন্ট পল পরিবর্তন করে ফেলেছিলো! আর সে বিকৃত পলীয় মতবাদই এখন 'খ্রিস্টধর্মরূপে' প্রচারিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিষয়টির পর্যালোচনা শেষে লেখক এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন যে, মূল আসমানী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল অনেক আগেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন বাইবেল নামে যা প্রচারিত, তা মূলত ইয়াহুদী সেন্ট পল এবং তার সমমনা অজ্ঞাতনামা কতক লেখকের 'বর্ণনাসূত্রহীন' রচনামাত্র।

তৃতীয় বিষয়টির পর্যালোচনায় পাঠক এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত দীন তাওহীদ ও একত্ববাদের হলেও প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম একটি শিরকী মতবাদ মাত্র, যাতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষার 'বিন্দু-বিসর্গ'ও অনুপস্থিত।

চতুর্থ বিষয়টির পর্যালোচনার পর লেখক এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন যে, 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশে হত্যা করা হয়েছে' মর্মে প্রচলিত বাইবেলে যে বর্ণনা রয়েছে, তা সঠিক নয়; বরং এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কেয়ামতের আগে তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন।

পঞ্চম বিষয়টির পর্যালোচনা শেষে লেখক প্রমাণ করেছেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত দীন ও শরীয়ত সার্বজনীন ছিলো না; বরং তা কেবল বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহুদী জাতির জন্য ছিলো। স্বয়ং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও এটা বলে গিয়েছেন।

ষষ্ঠ বিষয়টি পর্যালোচনার মাধ্যমে লেখক এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ নবী নন; বরং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষ নবী। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামসহ প্রায় সকল নবী-ই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন।

খ্রিস্টধর্মের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ এবং তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের নিমিত্তে আলহামদুল্লিাহ অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও গ্রহণযোগ্য অনেক সংকলন ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হযরত মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা. রচিত আলোচ্য গ্রন্থটির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা একজন পাঠককে নতুনভাবে, দ্বিধাহীনচিত্তে খ্রিস্টধর্মের অসারতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

এ পর্যায়ে আমরা আলোচ্য গ্রন্থটির মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি–

১. খ্রিস্টধর্মের বিষয়ে রচিত আলোচ্য গ্রন্থটির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো : বই পাঠের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠককে সিদ্ধান্ত নিতে কোনো চাপ সৃষ্টি করা হয়নি; বরং তথ্যনির্ভর গবেষণা এবং নিরপেক্ষ পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি পাঠকের উপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি পর্যালোচনা শেষে 'দরদে দীলে'র সাথে সত্য ও ন্যায়ের পথ-মত গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
২. গ্রন্থটির আলোচনাভঙ্গি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ। গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নিমিত্তে আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষমূলক আচরণ কিংবা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির যে কোনো উচ্চারণ সতর্কতার সাথে পরিহার করে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা, অতিরঞ্জন ও অসতর্কতা এড়িয়ে সত্য

ও ন্যায়ের পথ গ্রহণের জন্য গ্রন্থটিতে নিবেদন করা হয়েছে। ফলে একজন পাঠক অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে লেখকের আবেদন ও নিবেদনের সাথে আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

৩. খ্রিস্টধর্মের মৌলিক ছয়টি বিষয়ের পর্যালোচনাকে প্রথমত কুরআন, দ্বিতীয়ত হাদীস, তৃতীয়ত খ্রিস্টসামজের নিকট 'স্বীকৃত' বাইবেল এবং পঞ্চমত যুক্তির আলোকে প্রামাণ্য করা হয়েছে। ফলে একজন মুসলমান পাঠকের পাশাপাশি নিরপেক্ষ খ্রিস্টান পাঠকও এ বই হতে সমানভাবে উপকৃত হতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

৪. আলোচনা সংক্ষিপ্ত, যথেষ্ট প্রামাণ্য এবং খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিষয়াবলীতে সীমাবদ্ধ। এতে একজন পাঠক খুব সহজেই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে খ্রিস্টধর্মের অসারতার বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

৫. বিষয়বস্তুর প্রমাণে বাংলা বাইবেলের পাশাপাশি ইংরেজি বাইবেল থেকেও আগ্রহী পাঠকদের জন্য উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। যেন খ্রিস্টধর্মের আলোচনা খ্রিস্টধর্মীয় সমাজে স্বীকৃত মৌলিক উৎসগ্রন্থের উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ হয়।

৬. বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের জন্য বাইবেলের ইংরেজি উদ্ধৃতি অনুধাবনের সুবিধার্থে বাইবেলের পুস্তকসমূহের বাংলা ও ইংরেজি নামের একটি 'নির্ঘণ্ট' কিতাবের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৭. বাইবেলের বাংলা উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে 'বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি' কর্তৃক ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত জন কেরির 'পবিত্র বাইবেল' -এর অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা, বাইবেলের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে জন কেরির অনুবাদই খ্রিস্টসমাজে 'উৎস'-এর মর্যাদা রাখে। আর বাইবেলের ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কিং জেমস ভার্সন [KJV] -এর অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা, কিং জেমস ভার্সনই খ্রিস্টসমাজে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বাইবেলের প্রাচীনতম সংস্করণ।

৮. আলোচনাকে প্রামাণ্য ও উৎসগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ করতে গিয়ে অনেক খ্রিস্টান গবেষক ও পণ্ডিতগণের রচনা থেকেও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো মাধ্যম গ্রন্থের সহায়তা না নিয়ে সরাসরি উক্ত গবেষক বা পণ্ডিতের গ্রন্থ হতেই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার উদ্ধৃতিটি লেখক সংগ্রহ করেছেন ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-এ সংরক্ষিত ১৯৯০ সালে ট.ঝ.অ. থেকে প্রকাশিত ১৫তম সংস্করণের কপি থেকে। আর অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থগুলোর উদ্ধৃতিতে সাধারণত ইন্টারনেটের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। পাঠকের খোঁজার সুবিধার্থে উক্ত গ্রন্থগুলোর ওয়েবসাইটের ঠিকানা সহকারে একটি Bibliography গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯. ইংরেজি গবেষক ও পণ্ডিতগণের নাম উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে নামসংশ্লিষ্ট ভাষার 'উচ্চারণনীতি' অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে পাঠক উক্ত গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তি সনাক্তকরণে সহজতা লাভ করবেন বলে আশা করা যায়।

১০. যেহেতু এ বইয়ের পাঠক বাংলা-ভাষাভাষী মানুষ, কাজেই ইংরেজি উদ্ধৃতিগুলো লেখক সংশ্লিষ্ট স্থানের টীকায় সংযুক্ত করেছেন। যাতে বাংলা ভাষায় মূল আলোচনার সাবলীল বর্ণনায় তা বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

১১. তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণা ও পর্যালোচনার পর তা সহজে অনুধাবনের সুবিধার্থে বিস্তারিত আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ বইয়ের শেষ দিকে তুলে ধরা হয়েছে, যা মূল বইয়ের আলোচনাকে আরো সুস্পষ্ট করবে, ইনশাআল্লাহ।

১২. এ বইটির ইংরেজি সংস্করণের কাজও আলহামদুলিল্লাহ শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, পাশ্চাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টসমাজেও বইটির উপকারিতা পাঠক লাভ করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ!

সর্বোপরি, খ্রিস্টধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচ্য বইটি পাঠকের জন্য একটি 'মূল্যবান সংগ্রহ' হবে বলে আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থটিকে কবুল করে নিন এবং লেখক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আমীন।

**লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।**

======================

**(৪৭ পৃষ্ঠার পর; ওলী হওয়ার সহজ পথ)**

তুমি তোমার সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে সহজ সরল ভঙ্গীমায় কথা বল, তবে ইখলাসের সাথে বল, দেখবে এর দ্বারাই কাজ হবে। শ্রোতাদের দিলে আছর হবে।

**মুরুব্বী ধরো**

সর্বশেষ কথা হল, সকলে ইসলাহের জন্য মুরুব্বী ধরো। শাইখ ঠিক করে নাও। যাকে মনে চায় ইস্তেখারা করে বানিয়ে নিবে। বর্তমানে যারা আছেন তাদের থেকেই বানিয়ে নিবে। কারণ এখন তুমি হাফেজ্জী হুজুর তালাশ করলে পাবে না। এখন ছোট-খাটো যারা আছেন তাদের দিয়েই আল্লাহ কাজ চালাবেন। আল্লাহর নেযাম এমনই। বড় বড় আলেমরা চলে গেছেন। তাই বলে কি মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে? না, মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়নি। সেগুলো আল্লাহ চালাচ্ছেন। এই ছোটদেরকেই আল্লাহ তা'আলা যোগ্যতা দান করে তাদের দ্বারাই বুখারী-মুসলিমের দরস চালু রেখেছেন। মাদরাসা চলছে। ছাত্ররা আলেম হচ্ছে। এটাই আল্লাহর নেযাম। ইসলাহের জন্যও এযুগে যারা আছেন তাদের মধ্য থেকে যার সাথে মন লাগে যত দ্রুত সম্ভব তার সাথে সম্পর্ক গড়ে নাও। অবসর থেকো না। মনে রাখবে, সম্পর্ক করবে ইসলাহের উদ্দেশ্যে। এজন্য সব সময় পাগলপারা হয়ে থাকবে। তোমার মধ্যে কী দোষ আছে তার সবই শাইখের নিকট বলবে। না বললে ইসলাহ হবে কী করে, শাইখ তো আর গায়েব জানেন না। যেমন তোমার মধ্যে কিবির আছে, হাসাদ আছে, রিয়া আছে, লোভ আছে, বুখল আছে। আরো অনেক রোগই আছে। সব শাইখকে জানাতে হবে। তাহলে ইসলাহ সম্ভব হবে। আমি বলি, হযরত থানভী রহ. ইসলাহের যে নোসখা ও পন্থা দিয়েছেন সে নোসখা সকলে দিতে পারবে না। আর ইসলাহের জন্য তা লাগেও না। বরং আল্লাহ যাকে খিদমতের জন্য বসিয়েছেন তার দিলে যে নোসখা আসবে তা দিয়েই ইসলাহ হয়ে যাবে। সুতরাং গুনাহ ছেড়ে দাও। যারা এখনও কোন হক্কানী শাইখের মুরীদ হওনি তারা মুরীদ হয়ে যাও। আর যারা মুরীদ হয়েছো তারা নিজ নিজ শাইখের সঙ্গে পুরোপুরি যোগাযোগ রক্ষা করে চলো। আল্লাহ সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

**সংকলক : মুহাম্মাদ আল আমীন বিন সাবের; ফাযেল, জামিয়া আশরাফিয়া, সাইনবোর্ড, ঢাকা**

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

**আসাদুল্লাহ**
**শনির আখড়া, ঢাকা**

**২৮৭ প্রশ্ন :** আমি দেশের বাইরে থাকার কারণে আমার কুরবানীটি কী পশু দ্বারা করা হলো, জানতে পারিনি। ঈদের পর জানতে পারলাম গরু, মহিষ বা ছাগল দ্বারা কুরবানী করা হয়েছে। তো আমি যে দেখেশুনে পশু কিনলাম না, শুধু টাকা পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করলাম এতে কি কুরবানী আদায় যাবে?

আমরা জানি, যাকাত দেয়ার সামর্থ্য হলে তা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। অনুরূপ কুরবানী দেয়ার সামর্থ্য হলেও কি কুরবানী দেয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়?

উল্লেখ্য, প্রতিকূল পরিবেশের কারণে (যেমন, আমেরিকার কিছু স্টেটে) কুরবানী দেয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় অনুকূল পরিবেশে শুধু টাকা পাঠিয়ে কুরবানী করানো হলে তা আদায় হবে কি?

**উত্তর :** কুরবানীর শর্তাবলী পাওয়া গেলে যাকাত ও সদকায়ে ফেতরের ন্যায় কুরবানীও আবশ্যক হয়ে যায়, যা না করার অবকাশ থাকে না।

আর যেমনিভাবে নিজে দেখেশুনে পশু ক্রয় করে কুরবানী করা যায়, তেমনিভাবে অন্যের দ্বারা পশু ক্রয় করিয়ে কুরবানী করালেও তা আদায় হয়ে যায়।

সুতরাং পরিবেশের প্রতিকূলতা বা অবস্থার কারণে অন্যকে দিয়ে অনুকূল পরিবেশে কুরবানী করানোর সুযোগ রয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩১২৩, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৩, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৫/৭৭, ২৯/২৫৯)

**মুহাম্মাদ আসেম বিন ইযহার**
**জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা**

**২৮৮ প্রশ্ন :** আমাদের দেশের অধিকাংশ সরকারি চুকুরিজীবীগণ চাকুরির নিয়োগপত্রে আসল বয়স থেকে কিছুটা কমিয়ে লেখে। যার ফলে চাকুরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তারা সরকারি বেতন ভোগ করতে থাকে। জানার বিষয় হলো, চাকুরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তারা যে বেতন পাচ্ছে, সেটা হালাল হচ্ছে কিনা?

**উত্তর :** উক্ত ব্যক্তি যদি সেই চাকুরির যোগ্যতাসম্পন্ন হয় এবং দায়িত্বের সাথে তার নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করে, আর যে চাকুরি করছে, তা কোন হারাম বা অবৈধ কাজ না হয়, তাহলে সেখানে চাকুরি করা এবং সেখান থেকে বেতন গ্রহণ করা তার জন্য হালাল হবে, যদিও তার সঠিক বয়স অনুযায়ী চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কারণ সে বেতন পায় তার শ্রমের ভিত্তিতে; বয়সের ভিত্তিতে নয়।

তবে চাকুরির নিয়োগপত্রে বা যে কোনভাবে বয়স কমিয়ে লেখার কারণে মিথ্যা তথ্য দেয়া এবং প্রতারণা করার গুনাহ সর্বদা তার উপর থেকে যাবে। কাজেই এ গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা-ইস্তিগফার করবে এবং জন্ম-তারিখ ঠিক করার সুযোগ থাকলে ঠিক করে নিতে হবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০২, ১৬৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪১১, আল-বাহরুর রায়িক ৬/২৫১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/২৮৭-২৮৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/২৪৭)

**আবূ মায়মুন**
**জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা**

**২৮৯ প্রশ্ন : (ক)** ইস্তিকবাল বা সংর্ধনার বিধান কী এবং এর পদ্ধতি কী?

**(খ)** আমরা যেভাবে ইস্তিকবাল করি, তা শরীয়তসম্মত কিনা? অর্থাৎ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, তাকবীর দেয়া, মেহমানের প্রশংসা করা, কালিমাতুশ শুকর পাঠ করা ইত্যাদি।

**উত্তর : (ক)** আগন্তুককে ইস্তিকবাল তথা সংবর্ধনা প্রদান করা মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইস্তিকবাল করেছেন এবং আনসারী সাহাবায়ে কেরামদের নির্দেশ দিয়েছেন সা'দ ইবনে মু'আয রাযি.-কে দাঁড়িয়ে ইস্তিকবাল করার জন্য।

সুতরাং যে ব্যক্তি সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত, পাশাপাশি সম্মান প্রদর্শনের কারণে যার মনে কোন অহঙ্কার সৃষ্টির আশংকা নেই, তার সম্মানে দাঁড়িয়ে তাকে ইস্তিকবাল করা জায়েয আছে।

**(খ)** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় প্রবেশের সময় আনসারী সাহাবায়ে কেরাম ও মদীনার শিশুরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইস্তিকবাল করেছেন এবং প্রশংসা, কালিমাতুশ শুকর ইত্যাদি পাঠ করেছেন। অতএব রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে যেভাবে ইস্তিকবাল করা হয় তা শরীয়তসম্মত।

উল্লেখ্য, মেহমানের সঙ্গে মুসাফাহা করতে চাইলে তার ডান দিকে দাঁড়াতে হবে। আর কালিমাতুশ শুকরের মধ্যে অতিরঞ্জন অর্থাৎ অবাস্তব প্রশংসা জায়েয নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৮৪, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৮৪, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৩/৭৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩০৪৩, আর-রহীকুল মাখতূম; পৃষ্ঠা ২০৪, শরহুয যারকানী ২/১৪৮)

**মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন যশোরী**
**যশোর**

**২৯০ প্রশ্ন : (ক)** মহিলারা উচ্চস্বরে যিকির করতে পারবে কিনা? অনেকে উচ্চস্বরে যিকির করে। তারা বলে, উচ্চস্বরে যিকির করলে কলবের ময়লা দূর হয়। এমতাবস্থায় তাদের জন্য একাকী বা দলবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে যিকির করা জায়েয হবে কিনা?

**(খ)** পুরুষ বা মহিলাদের জন্য পিতা-মাতার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা জায়েয হবে কি? অনুরূপ পর্দার সাথে মহিলারা পীর সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে পারবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তর : (ক)** মহিলাদের আওয়াজ সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তারা শরীয়ত স্বীকৃত প্রয়োজন ছাড়া আওয়াজের সতর লঙ্ঘন করতে পারবে না। উচ্চস্বরে যিকির করতে হলে শর্ত হলো, কোন বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছতে পারে এমন আশঙ্কা না থাকতে হবে। কেননা এমন আশঙ্কা সত্ত্বেও সশব্দে যিকির করলে সতর ভঙ্গের গুনাহ হবে।

আর শুধু উচ্চস্বরে যিকির করলেই যে কলবের ময়লা দূর হবে, নিম্নস্বরে যিকির করলে ময়লা দূর হবে না; বিষয়টি এমন নয়। বরং নিম্নস্বরে যিকির করলেও আল্লাহ তা'আলা অন্তর পরিস্কার করে দিবেন।

আর দলবদ্ধভাবে যিকির করার তো কখনোই প্রয়োজন নেই এবং এক্ষেত্রে পরপুরুষের শুনতে পারার আশঙ্কা নিশ্চিত। অতএব তা জায়েয হওয়ার অবকাশই নেই। এ ধরনের যিকিরের প্রস্তাবকারী বা উদ্যোক্তা নিশ্চয় কোন ফেতনাবাজ হবে। (সূরা আহযাব- ৩২, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১২৫৩৪, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ১৮৫৯, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩৬৭, আহকামুল কুরআন লিল-আল্লামা শফী ৩/৩১৬, আযীযুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ২৩৬)

**(খ)** পুরুষ বা মহিলা কারো জন্য পিতা-মাতা অথবা পীর সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা জায়েয নয়। কেননা এটা অমুসলিমদের রেওয়ায।

বি.দ্র. মহিলারা কোন পীর সাহেবের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখতে চাইলে তাদের স্বামীর মাধ্যমে, স্বামী না থাকলে পিতার মাধ্যমে বা ভাইয়ের মাধ্যমে রাখতে হবে। মহিলারা সরাসরি পীর সাহেবের সাথে ইসলাহী কথাবার্তা বলবে না। তাদের হালত মাহরামের মাধ্যমে জানাবে। বর্তমান ফেতনার যামানায় মহিলাদের সরাসরি ইসলাহী সম্পর্ক রাখা পীর-মুরীদ সকলের জন্য আশঙ্কাজনক কাজ। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬৯, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৩১, আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া ১৩/১০২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৭/২১২)

**নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক**
**রুহিতপুর, কেরাণীগঞ্জ**

**২৯১ প্রশ্ন :** আমার মেয়ের বয়স প্রায় পনের বছর। সে একটি ছেলের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে স্বেচ্ছায় পালিয়ে যায়। একদিন পর তিনজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মসজিদের ইমাম দ্বারা বিবাহ করে নেয়। উল্লেখ্য, উক্ত তিনজন সাক্ষীই ছেলের বন্ধু। পালিয়ে যাওয়ার পঁচিশ দিন পর মেয়েকে আমরা উদ্ধার করি। ছেলে একজন দিনমজুর, নেশাখোর, চরিত্রহীন।

পক্ষান্তরে আমি মেয়ের বাবা একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং কোটিপতি। এমতাবস্থায় ছেলেটি চরিত্রহীন জানতে পেরে আমার মেয়ে এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। আর আমার পরিবারের সদস্যরাও এ বিবাহে সম্মত নয়। অতএব আমার জানার বিষয় হলো, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উক্ত বিবাহ সহীহ হয়েছে কিনা? আর এ বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার উপায় কি? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে আপনার মেয়ে যখন পালিয়ে গিয়ে একজন দিনমজুর, নেশাখোর ও চরিত্রহীন ছেলেকে তিনজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মসজিদের ইমাম দ্বারা বিবাহ করে, এর দ্বারা শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের পরস্পর বিবাহ সহীহ হয়নি। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে সাবালিকা মেয়ে যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে উভয় পরিবারের মাঝে কুফু তথা সমতা থাকতে হবে। প্রশ্নের বর্ণনামতে আপনার ও ছেলের মধ্যে আর্থিক সমতা বিদ্যমান নয়। সুতরাং আপনার অমতে এ বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। এখন আপনি পিতা (অভিভাবক) ইচ্ছা করলেই কোন রকম তালাক ছাড়াই আপনার মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দিতে পারবেন। অবশ্য আপনার মেয়েকে তওবা করিয়ে পর্দা ও দীনদারীর সাথে চলার ব্যবস্থা করাও আপনার জন্য অবশ্য কর্তব্য। (আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৫-৫৭, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৪১/২৪৯, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৪/১০০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৮/৩৯, ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ৪৪৫)

**উম্মে নাফীসা**
**মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

**২৯২ প্রশ্ন : (ক)** বাজারে কিছু পোশাক রয়েছে, যেগুলো মূলত মেয়েদের জন্যই তৈরি হয়েছে, কিন্তু দেখতে পুরুষদের পোশাকের মত মনে হয়। সেগুলো মেয়েদের জন্য পরিধান করার বিধান কি?

**(খ)** মুসলমান মেয়েদের জন্য নেইল পলিশ ব্যবহার করা (চাই তার উপর নামায ফরয থাকুক বা না থাকুক) জায়েয আছে কিনা?

**উত্তর : (ক)** হাদীস শরীফে নারীদেরকে এমন পোশাক পরিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেগুলো এমন পাতলা না হয় যে, শরীরের রং ফুটে ওঠে এবং ঢিলাঢালা হয় ও পুরো শরীর আবৃত থাকে। যেন পর্দা পরিপূর্ণরূপে অর্জন হয়। যদি মহিলারা এমন পোশাক পরিধান করে যাতে শরীরের গঠন-আকৃতি প্রকাশ পায়, ঐ পোশাক পরিধান করেও না পরার শামিল। পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষদের পোশাক ভিন্ন ও নারীদের পোশাক ভিন্ন। সুতরাং পুরুষদেরকে পুরুষের পোশাক ও নারীদেরকে নারীর পোশাকই পরিধান করতে হবে।

যদি কোন পুরুষ নারীদের পোশাক বা কোন নারী পুরুষদের পোশাক পরিধান করে তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং বলেছেন, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তো দূরের কথা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

অতএব এমন পোশাক যা দেখতে পুরুষের পোশাকের মত করে তৈরি করা হয়েছে নারীদের জন্য যেমন, টি-শার্ট, শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি নারীদের জন্য পরিধান করা জায়েয হবে না; বরং তা হারাম।

সারকথা, পুরুষদের সামঞ্জস্যতা থেকে নারীদেরকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে। (সূরা আ'রাফ- ২৬, সূরা নূর- ৩১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১২৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৮৮৫, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৩১, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩৫/১৯৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৪২৩, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৫/৩৫৯)

**(খ)** নেইল পলিশ বা এ জাতীয় কোন কেমিক্যাল যা শরীর বা নখের উপর লাগানো হয় এতে নখের উপর এক ধরনের আবরণ পড়ে যায়। ফলে আবরণের নিচে পানি প্রবেশ করে না। তাই এগুলো ব্যবহার করার পর উযূ-গোসল সহীহ হবে না। অতএব এটা নামায আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। এ কারণে এগুলো ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

তবে যদি কারো উপর নামায ফরয না থাকে অথবা নামায ফরয থাকলেও নেইল পলিশ ব্যবহার করার পর তা তুলে নিয়ে তারপর উযূ করে নামায আদায় করে এবং শুধু সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে অল্পসময় নেইল পলিশ ব্যবহার করে তাহলে দীনদার মুসলমান মেয়েদের জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয হলেও ব্যবহার না করা উচিত। কারণ অন্য মেয়েরা তাদের দেখাদেখি ব্যাপকভাবে এবং সব সময়ের জন্য ব্যবহার শুরু করে দিবে; নামায বা ফরয গোসলের সময়ও সেগুলো তুলে নিয়ে উযূ-গোসল করবে না। ফলে তারা গুনাহগার হবে। আর কারও এমন কাজ করা উচিত নয়, যার

দ্বারা অন্যরা গোমরাহ হয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪১৬৫, ৪১৬৬, আদ্দুররুল মুখতার ১/১৫৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৫/৪৬৯, ৫৪৪)

**ইশরাক আহমাদ**
**খিলগাঁও, ঢাকা**

**২৯৩ প্রশ্ন :** গত বছর আমাদের বাসায় আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর আয়োজন করেছিলাম। অনুষ্ঠানের পূর্বে যখন প্যান্ডেল তৈরি করা হয় তখন কিছু হিজড়া এসে দশ হাজার টাকা দাবী করে। অনেক বিরক্ত করার পর আমরা পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেছি এবং উক্ত টাকায় যাকাত আদায়ের নিয়ত করেছি।

এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত টাকা কি যাকাত হিসেবে আদায় হয়েছে, নাকি পৃথকভাবে আবার এই পরিমাণ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে?

উল্লেখ্য, আমাদের দেশের এসব হিজড়ারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কিনা তা আমাদের জানা নেই।

**উত্তর :** হিজড়াদের যাকাত দেয়ার সময় যদি চিন্তা-ফিকির করে তারা যাকাতের উপযুক্ত ধারণা করে তাদেরকে যাকাত দিয়ে থাকেন, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে গেছে। আর যদি চিন্তা-ফিকির ছাড়াই যাকাত দিয়ে থাকেন তাহলে যাকাত আদায় হবে না, যদি বাস্তবেই তাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৬৫২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৯, ১৯০, কিতাবুন নাওয়াযিল ৭/৭২)

**মুনীরুজ্জামান**
**পাইকগাছা, খুলনা**

**২৯৪ প্রশ্ন :** আমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক লোন নিয়ে থাকি। যা কিস্তি বা বিভিন্ন মেয়াদে পরিশোধ করতে হয়। প্রশ্ন হলো, লোনের টাকা যাকাতের নিসাবে গণ্য হবে কিনা? যদি এমন লোনের টাকা যাকাতের নিসাবে গণ্য করে যাকাত আদায় করতে হয়, তবে তার পদ্ধতি কী? বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ করছি।

**উত্তর :** মানুষ সাধারণত দু' ধরনের উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে থাকে-

(এক) প্রবৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্য ব্যতীত চিকিৎসা, সাংসারিক প্রয়োজন বা এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে থাকে। যদি তা অল্প সময়ের মধ্যে আদায়যোগ্য হয়, তাহলে এ প্রকারের ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টি হতে বিয়োগ করা হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করা হবে।

(দুই) প্রবৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণ (Development Loan) যা সাধারণত পুঁজিপতিরা আর্থিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নিয়ে থাকে। যেমন, ফ্যাক্টরি স্থাপন, মেশিনারি ক্রয়, ব্যবসাপণ্য আমদানী বা পূর্ব হতেই ফ্যাক্টরি রয়েছে, এখন নতুন ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে হবে, বর্তমানে এসব উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের লোন নিয়ে থাকে।

প্রবৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণ (Development Loan) এর ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, দেখতে হবে সে ঋণ কোন্ খাতে ব্যয় করা হয়েছে। যদি সে অর্থ দ্বারা এমন সম্পদ ক্রয় করা হয়, যা যাকাতযোগ্য; অর্থাৎ সে সম্পদের যাকাত দিতে হয়, উদাহরণত মূল ব্যবসাপণ্য তথা কাঁচামাল ইত্যাদি, তাহলে সে ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ করতে হবে। আর যদি তা দ্বারা এমন সম্পদ ক্রয় করা হয়, যা যাকাতযোগ্য নয়, যেমন ফ্যাক্টরির জন্য মেশিনারি, জমি ইত্যাদি, তাহলে সে ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টি হতে বিয়োগ করা হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, জনৈক ব্যক্তি ব্যাংক হতে এক কোটি টাকা ঋণ নিল। আর ঐ অর্থ দিয়ে সে বিদেশ থেকে কোন মেশিন আমদানী করল। যেহেতু এ মেশিন যাকাতযোগ্য কোন বস্তু নয়। কাজেই এ ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ হবে না। কিন্তু যদি এ ঋণ দ্বারা কাঁচামাল ক্রয় করতো, তাহলে কাঁচামাল যেহেতু যাকাতযোগ্য সম্পদ, তাই এ ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ করা হবে। কেননা উক্ত ঋণ দ্বারা ক্রয়কৃত কাঁচামাল পূর্বেই আদায়যোগ্য যাকাতের সমষ্টিগত মূল্যমানের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। ফেত

সারকথা, সাধারণ প্রকৃতির ঋণ তো সমষ্টিগত মূল্যমান হতে বিয়োগ হয়ে যাবে (তথা যাকাতযোগ্য নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না)। কিন্তু যেসব ঋণ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ব্যাখ্যা হলো, যদি এর দ্বারা যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয় করা না হয়, তাহলে সে ঋণ যাকাতের নিসাব থেকে বিয়োগ করা হবে না। অর্থাৎ সে টাকার গড় সম্পদ যেমন যাকাতের হিসাবে আসবে না, তেমনিভাবে অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের মূল্যমান থেকে বিয়োগও হবে না। আর যদি যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয় করা হয়, তাহলে সে সম্পদ যাকাতের সমষ্টিগত নিসাবে গণ্য করা হবে এবং সমষ্টিগত নিসাব থেকে ঋণ পরিমাণ অর্থ বিয়োগও হবে। বাকি থাকলো এ ঋণ এবং প্রথমোক্ত ঋণ যদি দীর্ঘ মেয়াদী এবং কিস্তি ভিত্তিক হয়, তাহলে উভয় ঋণের ক্ষেত্রে বিধান হলো, যে বছর যে পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, শুধু সে পরিমাণ ঋণ নিসাব থেকে বিয়োগ করবে। যে ঋণ এ বছরব্যাপী চাওয়া হবে না এবং ঋণ গ্রহীতাও পরিশোধ করবে না, সে ঋণ চলতি বছরের নিসাব থেকে বাদ দিবে না। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ১০/৭৯২৬, আল-জাওহারুন নাকী ৪/১৪৯, ফিকহুয যাকাত; পৃষ্ঠা ৩৬৩, ফিকহী মাকালাত ৩/১৫৬, ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারত; পৃষ্ঠা ৯৪, কিতাবুল মাসাইল ২/২২৫)

**মাহমুদ বিন মাহমুদ**
**নারায়ণগঞ্জ**

**২৯৫ প্রশ্ন : (ক)** শেয়ার ব্যবসা যে হারাম তা আমার জানা ছিল না। কিছুদিন হল জানতে পেরেছি। কিন্তু এখন এমন লোকসানে আছি যে, যে দামে শেয়ার ক্রয় করেছি সে দামও আসছে না। তাই কিছু শেয়ার লাভে বিক্রি করে বের হয়ে আসতে চাই। (আল্লাহ চাহে তো এরপর আর কোন দিন শেয়ার মার্কেটিংয়ে সম্পৃক্ত হবো না)। কিন্তু যে ক'দিন থাকতে চাচ্ছি সে ক'দিন গুনাহ হবে তা-ও জানি। আর আমার এমন কোন মাধ্যমও নেই, যার দ্বারা আমি শেয়ারের লোকসান কাটিয়ে উঠবো। এখন আমার করণীয় কী?

তাছাড়া শেয়ারের টাকার উপর যাকাত আসবে কিনা? যদি যাকাত আসে তাহলে কিভাবে হিসাব হবে?

**(খ)** বর্তমানে বিভিন্ন ক্রোকারিজের দোকানে ও বাণিজ্য মেলায় এমন সব বাসনপত্র পাওয়া যায় যেগুলো দেখতে স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা তৈরি বাসনপত্রের সাদৃশ্য রাখে। জানতে চাই, এ ধরনের বাসনপত্র ব্যবহারের হুকুম কি?

**(গ)** আমাদের দেশে বহু ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও হিন্দুরাষ্ট্র থেকে পণ্য আসছে এবং ইয়াহুদী, খ্রিস্টান পরিচালিত বহু কোম্পানীর পণ্য বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এসব পণ্যে হালাল শব্দ লেখা দেখা যায়, তো হালাল শব্দ লেখা থাকলেই কি পণ্যটি হালাল বিবেচিত হবে? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

**উত্তর : (ক)** বর্তমানে প্রচলিত শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম। কারণ প্রচলিত শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় এক ধরনের জুয়ায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া শেয়ার বাজারের প্রায় সব ক'টি কোম্পানী সুদী কারবারে জড়িত রয়েছে। সুতরাং আপনার কাছে যে শেয়ারগুলো রয়েছে সেগুলোর শেয়ার বাজার-মূল্য কোম্পানীর 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু'র সমপরিমাণ হলেই বিক্রয় করে এ ব্যবসা থেকে দ্রুত বের হয়ে পড়বেন। এতে যদি আর্থিক ক্ষতি হয় তাহলে পরকালের দিকে চেয়ে সেই ক্ষতি মেনে নিবেন।

হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন সম্পদ উপার্জনে এ মর্মে কোন তোয়াক্কা করবে না যে, সে হালাল উপার্জন করেছে, নাকি হারাম উপার্জন করেছে। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, এদের অনেককেই মুখ না সামলানো (হারাম ভক্ষণ) এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত না করার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, হারাম খাদ্যে লালিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই; আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ স্থির করেছেন।

সুতরাং চিরস্থায়ী পরকালে শান্তির প্রত্যাশী কোন মুসলমান ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রাচুর্যের লোভে আখেরাতে শাস্তির ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে না।

তাছাড়া এ ব্যবসায় লোকসান কাটিয়ে উঠারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই। আপনি অন্য কোন হালাল পন্থায় অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তাতে বরকত দান করবেন।

যারা ভুলক্রমে শেয়ার ব্যবসায় জড়িয়ে গেছে তারা শেয়ারের বাজার মূল্য হিসেবে যাকাত দিয়ে দিবে। (সূরা মায়িদা- ৯০, সূরা বাকারা- ২৭৫, সূরা তালাক- ২, ৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ২০৮৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২০০৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫১৩, রদ্দুল মুহতার ২/২৭৩, ৫/৬৫, ৬৪৬, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ২০/১৯০, কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/২৬৮, ইসলাম কী মা'আশী নিযাম ৭/২১৮, ২১৯)

**(খ)** শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা তৈরিকৃত পাত্র ব্যবহার করা নাজায়েয ও হারাম। প্রশ্নে উল্লিখিত বাসনপত্র যেগুলো দেখতে স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা তৈরি বাসনপত্রের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সেগুলোতে যদি স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্য কোন জিনিসের প্রলেপ দেয়া থাকে তাহলে ব্যবহার করতে কোন সমস্যা নেই। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৪৩, ৩৪৪, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/৫৪, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ২৪/৪১০)

**(গ)** প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে যে সমস্ত পণ্যের গায়ে হালাল লেখা দেখা যায় এবং সেগুলো হারাম হওয়ার কারণ সনাক্ত করা না যায়, সেগুলো হালাল হিসেবে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কারণ আজকাল অনেক কাফের কোম্পানীও তাদের তৈরি জিনিসে 'হালাল' লিখে দেয়। অথচ হালাল-হারাম সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। সুতরাং সাধ্যমত যাচাই-বাছাই করতে চেষ্টা করবে। শুধু ঐ লেখার উপর ভরসা করবে না। (আহকামুল মালিল মুখতালাত; পৃষ্ঠা ১২৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৬৬)

**আব্দুল হামীদ**
**বনানী, ঢাকা**

**২৯৬ প্রশ্ন : (ক)** আমার এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারী এনজিওরা মেহনত করে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছে। আমি গত পাঁচ বছর যাবত এলাকায় ছোট ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য একটি মকতব চালু করি। আমার এলাকা মঙ্গা কবলিত এবং আমি ঢাকায় থাকার কারণে মকতবের শিক্ষকদের বেতনের ব্যবস্থা ঢাকা থেকেই করে আসছি। আমাকে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করেছেন তার মধ্যে যাকাত, সদকায়ে ফিতর, মানত, সাধারণ দান বিভিন্ন নিয়তে দিয়ে থাকেন যা পৃথক করা অসম্ভব। একজন মুফতী সাহেবের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে মুফতী সাহেব বাচ্চাদের মাসিক বেতন নির্ধারণ করে তাদের হাতে টাকা দিয়ে বেতন পরিশোধ করে নিতে বলেন। কিন্তু এভাবে বাচ্চাদের দিয়ে আবার নিয়ে নিলে অনেক ফিতনা হয়। আমাকে অনেকে অনেক কথা বলে– টাকা দিয়ে বাচ্চাদের কাছ থেকে আবার নিয়ে নেয়। এর সমাধান কী হতে পারে?

**(খ)** আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার এলাকায় একটি দীনী প্রতিষ্ঠান করার জন্য কিছু জমি দান করেছি এবং প্রতিষ্ঠান করার জন্য মেহনত করছি। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য আমি যে পরিমাণ সময় মেহনত করছি, তার জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু খরচের দরকার হয়। তাই আমি চাকুরিতে প্রতিদিন যে পরিমাণ আয় করি, সে হিসেবে মাদরাসায় যে পরিমাণ সময় দিই, সে পরিমাণ বেতন নেই। চাকুরিতে প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ করে মাসে পঁচিশ দিন ডিউটিতে আঠারো হাজার টাকা বেতন পাই। সুতরাং প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে পঁচিশ দিনে দুইশত ঘণ্টা হয়। সে হিসেবে চাকুরিতে ঘণ্টায় আমার বেতন নব্বই টাকা। সুতরাং চাকুরির হিসাব অনুযায়ী মাদরাসার কাজ করে ঘণ্টায় নব্বই টাকা নিতে পারব কিনা?

**(গ)** আমি যাকাতের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকদের থেকে গ্রহণ করি এবং এই টাকা দিয়ে আমি একটি জায়গা কিনে রাখি। এখন যারা যাকাত দিলেন তাদের যাকাত যেন আদায় হয়ে যায়, সাথে সাথে আমাদের মাদরাসায় যাকাতের টাকা কিভাবে কাজে লাগানো যায় এর একটি উত্তম সুরত বলে দিলে খুবই উপকৃত হব।

**উত্তর : (ক)** প্রশ্নোক্ত সমস্যার সহজ সমাধান হলো, মাদরাসার একজন সাধারণ শিক্ষককে যাকাত গ্রহণের যোগ্য ছাত্রদের যিম্মাদার নিযুক্ত করা হবে। অতঃপর যাকাতযোগ্য ছাত্র বালেগ হলে সে নিজে আর নাবালেগ হলে অভিভাবক ঐ শিক্ষকের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের খোরাকী ও বেতন-ভাতার টাকা লিল্লাহ তহবিল থেকে গ্রহণ করে সাধারণ ফান্ড ও খোরাকী ফান্ডে জমা দেয়ার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করবে। এরপর প্রতি মাসের শুরু বা শেষে লিস্ট করে মাসের খোরাকী ও বেতনের টাকা লিল্লাহ ফান্ড থেকে উত্তোলন করে সংশ্লিষ্ট ফান্ডে জমা করে রসিদ সংগ্রহ করবে এবং রসিদগুলো ছাত্রদেরকে আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরকে দিয়ে দিবে।

এছাড়া যাকাত এবং ওয়াজিব সদকার টাকা তামলীক করার আরেকটি পদ্ধতি

হলো, প্রথমে যাকাত গ্রহণের যোগ্য এক ব্যক্তিকে মাদরাসায় দান করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। তারপর তাকে বলা হবে, কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মাদরাসায় দান করুন। আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবো। এরপর যখন ঋণ গ্রহণ করে মাদরাসায় দান করবে, তখন তাকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর উক্ত টাকা দিয়ে সে তার ঋণ পরিশোধ করবে।

উল্লিখিত সুরতে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক যে টাকা মাদরাসায় দান করা হলো, সেই টাকা দিয়ে শিক্ষকের বেতন দিতে কোন অসুবিধা নেই। আর এ পদ্ধতি অবলম্বন করার ক্ষেত্রে যদিও শরঈ বাধা থাকে না, কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা শরীয়তের রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত নয়, তাদের মধ্যে জানাজানি হলে তাতে ফিতনা ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।

**(খ)** মাদরাসার টাকা কালেকশন করার ক্ষেত্রে কালেকশনকারীর জন্য নির্দিষ্ট বেতন ধার্য করা হবে। চাই বেতন মাসিক বা দৈনিক বা পার্সেন্টিজ হিসেবে হোক। সুতরাং ঘণ্টার হিসেব ধরে বেতন নির্দিষ্ট করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, কাজের বিনিময়ে বেতন নেয়ার চুক্তিটি দ্বিপাক্ষিক। সেখানে আপনি একাই উভয় পক্ষ হতে পারবেন না। বরং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষ আর আপনি দ্বিতীয় পক্ষ হবেন। তাছাড়া এই বেতনের টাকা যাকাত এবং ওয়াজিব সদকার টাকা থেকে নেয়া জায়েয নয়। বরং মাদরাসার সাধারণ ফান্ড থেকে দিতে হবে।

**(গ)** গরীবদের জন্য যাকাত গ্রহণের দ্বারা দাতাদের যাকাত আদায় হয়ে গেছে বটে, কিন্তু যাকাতের টাকায় জমি ক্রয় করা মোটেও সহীহ হয়নি।

এখন আপনাদের করণীয় হলো, জমি ক্রয়ের কথা বলে পঞ্চাশ হাজার টাকা কালেকশন করে অথবা মাদরাসার সাধারণ ফান্ড থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে নিবেন। অতঃপর সে টাকা লিল্লাহ ফান্ড থেকে নেয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার বদলে লিল্লাহ ফান্ডে জমা দিয়ে দিবেন। এতে জমিটি মাদরাসার নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যাবে এবং লিল্লাহ ফান্ডের দায়ও শেষ হয়ে যাবে। (সূরা তাওবা- ৬০, রদ্দুল মুহতার ২/২৭১, ৩৪৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭, ২০৯, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৪৬৭, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৪৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৩১৬, তুহফাতুল উলামা ১/৩৭১)

**মাজেদুল ইসলাম**
**মাইজদী, নোয়াখালী**

**২৯৭ প্রশ্ন :** জনৈক মহিলার স্বামী ইন্তিকাল করেছেন। তাদের সন্তানাদি চারজন। তার স্বামীর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিলো এবং ব্যবসা অনুপাতে তার সেই পরিমাণ ঋণও রয়েছে। বর্তমানে উক্ত মহিলা একটি স্কুলে চাকুরি করেন। বেতন বাইশ হাজার টাকা। চার সন্তানের ভরণ-পোষণ ও লেখা-পড়ার খরচ চালাতে তাকে রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এই সন্তানেরা কি যাকাতের টাকা গ্রহণ করতে পারবে?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাতের টাকা গ্রহণের যোগ্য ঐ সকল লোক, যাদের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও ঋণমুক্ত সম্পদ (চাই তা আসবাবপত্র হোক কিংবা জায়গা সম্পত্তি বা যেকোন সামগ্রী হোক) নিসাব পরিমাণ তথা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ নগদ অর্থ (যা বর্তমানে প্রায় ৪০,০০০/- টাকা) থেকে কম থাকে।

সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে উক্ত ছেলে-মেয়েরা যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং উল্লিখিত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তাহলে যাকাতের টাকা গ্রহণ করতে পারবে। (সূরা তাওবা- ৬০, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৯৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৭৮৩, রদ্দুল মুহতার ২/৩৩৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৭, ১৮৯, কিতাবুন নাওয়াযিল ৭/৫২-৫৩)

**জাহাঙ্গীর আলম**
**সৌদিআরব**

**২৯৮ প্রশ্ন :** আমি একজন প্রবাসী। একটি কোম্পানির অধীনে চাকুরি করি। কিন্তু কোম্পানির বেতন কম থাকায় আমি কোম্পানির বাইরেও কাজ করে থাকি। এতে তাদের পক্ষ থেকে অনুমতিও রয়েছে। তবে অনেক সময় আমি কোম্পানির ডিউটিরত অবস্থায় কোম্পানির কাজ শেষ করেও অনেক সময় ফ্রি থাকি। সে সময়ে কোম্পানির কাজ ছাড়া বাইরে ছোটখাটো কিছু কাজ করে থাকি। যেমন রুম পরিষ্কার করে দিই। আমার জানার বিষয় হলো, এই কাজ করা এবং এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে কিনা?

**উত্তর :** কোম্পানির পক্ষ থেকে ডিউটির সময়ে কোম্পানির কাজ শেষ করে হলেও বাইরে কাজ করা বৈধ নয়। বাস্তবেই যদি কাজ শেষ হয়ে থাকে তখন কোম্পানিকে অবগত করা যেতে পারে। এরপর যদি কোম্পানি অনুমতি দেয় তখন আপনার জন্য প্রয়োজনে বাইরে কাজ করা বৈধ হবে।

আপনি কোম্পানির ডিউটিরত অবস্থায় বাইরে যে কাজ করেছেন তা যদি অনুমতি ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে সেটা আপনার জন্য গুনাহের কাজ হয়েছে। এর জন্য তওবা এবং ইস্তিগফার করতে হবে। তবে কাজ করে যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন তা আপনার জন্য বৈধ। আর কোম্পানিকে ফাঁকি দেয়ার সময়টুকুর বেতন আপনার জন্য হালাল হবে না। অনুমান করে ঐ সময়টুকুর বেতন কোম্পানিকে ফেরত দিতে হবে, অথবা কোম্পানির মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। (আল-মাবসূত ১৫/১৮২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/১৬২-১৬৩)

**উম্মে আব্দুল মুঈদ**
**ঢাকা**

**২৯৯ প্রশ্ন :** আমি জীবিকার তাগিদে একান্ত বাধ্য হয়ে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে রোগী সেবার চাকুরি করছি। চাকুরি নেয়ার সময় আমার নিজের সার্টিফিকেটের বয়স পার হয়ে যাওয়ায় আমার বোনের সার্টিফিকেট জমা দিয়ে চাকুরি নিয়েছিলাম। আমার বোন এবং বোন-জামাই দু'জনেই সম্মত ছিলো এবং এখনো আছেন।

কিন্তু আমার জানার বিষয় হলো, বোনের সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকুরি করে যে অর্থ আমি আয় করি তা আমার সংসারের জন্য হালাল হবে কিনা?

**উত্তর :** আপনার বোনের সার্টিফিকেট জমা দিয়ে চাকুরি নিয়ে কর্তৃপক্ষকে আপনি ধোঁকা দিয়েছেন। যারা ধোঁকা দেয় তাদের ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠিন ধমকি এসেছে। তাই এমনটি করা আপনার জন্য ঠিক হয়নি। এখন আপনার করণীয় হলো, আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাঁটি দিলে তওবা করা।

তবে উক্ত চাকুরি করার মত পর্যাপ্ত যোগ্যতা যদি আপনার মধ্যে থাকে এবং আপনার কারণে রোগীদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই চাকুরি করে যে অর্থ আপনি আয় করেন তা আপনার এবং আপনার সংসারের জন্য হালাল হিসেবেই গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, আমাদের শরীয়তে স্বামী মা'যূর (অক্ষম) না হলে স্ত্রীর জন্য বাইরে গিয়ে চাকুরি করা নিষেধ। আর আল্লাহর

নাফরমানী করে স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব নয়। সুতরাং আপনার স্বামী মা'যূর না হলে আপনি ঘরের ভিতরে থেকে হালাল রিযিকের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০২, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৪৫২, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৪৫, মাজমাউল আনহুর ৪/১৮৪, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৩/২০২, কিতাবুন নাওয়াযিল ১২/৫১৪)

**মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার**
**গফরগাঁও, মোমেনশাহী**

**৩০০ প্রশ্ন : (ক)** অনেক সময় দেখা যায়, কারো বিদায়ের সময় বলে দেয়া হয় যে, গন্তব্যে পৌঁছে অমুক ব্যক্তিকে আমার সালাম বলবে। তো এক্ষেত্রে সালাম পৌঁছানোর সঠিক পদ্ধতি কী? 'আস্সালামু আলাইকুম' বলা কি জরুরী?

**(খ)** মসজিদের ছাদের উপর ইজতিমায়ী সামানা রাখা, এসব ধৌত করা, শুকানো এবং মাথার চুল কাটা ও জরুরত হলে গোসল করার বিধান কী?

**উত্তর : (ক)** যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বিদায়ের সময় বলে যে, গন্তব্যে পৌঁছে অমুক ব্যক্তিকে আমার সালাম জানাবে তাহলে যখন উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হবে তখন সেই ব্যক্তিকে বলবে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে সালাম বলেছেন, তখন সে وعليك وعليه السلام (ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম) বলে জবাব দিবে। 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে সালাম বলা আবশ্যক নয়। (সূরা নিসা- ৮৬, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৭৬৮, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৪৮৫৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৬২০৯, আল-মুহীতুল বুরহানী ৫/৩২৯, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৫/২৫৩)

**(খ)** মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর; এর সর্বাত্মক সম্মান বজায় রাখতে হবে। মসজিদের ছাদের উপর ইজতিমায়ী সামানা রাখা, ধৌত করা, শুকানো, মাথার চুল কাটা এবং জরুরত হলে গোসল করা শরীয়ত সম্মত নয়। কাজেই মসজিদের ছাদে এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে মুসাফির এবং ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে থাকা এবং মসজিদের আদব পরিপন্থী নয় এমন কাজ করার অবকাশ রয়েছে। (সূরা বাকারা- ১২৪, রদ্দুল মুহতার ১/৬৫৬, ৬৬১, ৪/৪৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪০৭, আল-বাহরুর রায়িক ৫/২৭০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৮/১৭৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/১৮৯, তাবয়ীনুল হাকায়িক ৩/৫৫৭)

**উত্তর বাড্ডা বাইতুল মোকাদ্দাস জামে মসজিদ ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ, ঢাকা**

**৩০১ প্রশ্ন :** আমাদের মহল্লার মসজিদ ও মাদরাসা একই কমিটি দ্বারা পরিচালিত। তবে মসজিদ ও মাদরাসার ব্যাংকিং হিসাব আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়। মসজিদের মুআযযিন ও খাদেমগণ বিভিন্ন সময় মাদরাসার কাজকর্ম করে থাকেন। যেমন, মুআযযিন সাহেব কর্তৃক মাদরাসার দান-অনুদান, মাসিক চাঁদার টাকা ইত্যাদি রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করা এবং তা ব্যাংকে জমা দেয়া। খাদেম সাহেব কর্তৃক বিভিন্ন সময় মাদরাসার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করা। এমতাবস্থায় জানার বিষয় হলো–
মসজিদের মুআযযিন ও খাদেমদের মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে ফ্রি খানা খাওয়া জায়েয হবে কিনা?

**উত্তর :** মসজিদের মুআযযিন বা খাদেমদের জন্য টাকা উঠানো, মাদরাসার পরিচ্ছন্নতার কাজ যদি দায়িত্ব হিসেবে অর্পিত থাকে তাহলে তাদের জন্য মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে ফ্রি খানা খাওয়া জায়েয হবে। আর মাদরাসার দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকলে মাদরাসার বোর্ডিং থেকে টাকা দিয়ে খানা খাওয়ার অবকাশ তো আছেই। (সূরা তাওবা- ৬০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৮২, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৭২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৭, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৪/১৯৬)

**মুফতী মুজীবুর রহমান**
**কুমিল্লা**

**৩০২ প্রশ্ন :** জনৈক ব্যক্তি একটি পুরাতন কবরস্থান সংলগ্ন স্বীয় জমির কিছু অংশ মাদরাসার জন্য এবং কিছু অংশ উক্ত কবরস্থানের জন্য ওয়াকফ করেন। মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু কবরস্থানের জন্য ওয়াকফকৃত জমির কিছু অংশ খালি পড়ে আছে। ভবিষ্যতেও কবরস্থানের কাজে লাগার সম্ভাবনা নেই। খালি পড়ে থাকার দরুণ অবৈধ দখলদারীর আশংকা রয়েছে। বর্তমানে উক্ত জমিতে মাদরাসার টয়লেট বানানো হয়েছে। কারণ মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত জমি কম হওয়ায় মাদরাসার জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না। আরো জমির প্রয়োজন। কবরস্থানের খালি জায়গাটুকু মাদরাসার জন্য বেশ উপযোগী। ওয়াকিফ কর্তৃপক্ষও উক্ত জমি মাদরাসায় দিতে রাজি আছে। এখন জানার বিষয় হলো–
(এক) কবরস্থানের খালি জায়গা মাদরাসার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে কিনা?
(দুই) উক্ত জায়গায় মাদরাসার টয়লেট বানানো বৈধ হয়েছে কিনা?

**উত্তর :** মাদরাসা-মসজিদ, কবরস্থান বা কোন কল্যাণমূলক কাজে জায়গা-জমি ওয়াকফ করার পর তাতে ওয়াকফের স্বার্থ পরিপন্থী কোন ধরনের হস্তক্ষেপ (পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ভাড়া, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি) করার অবকাশ নেই। এমনকি ওয়াকফকারী ওয়াকফ করার সময় বিশেষ কোন শর্ত না করে থাকলে তার নিজের জন্যও ওয়াকফ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার আর সুযোগ থাকে না।
কিন্তু উল্লিখিত সূরতে কবরস্থানের জমিটি যদি ওয়াকফকৃতও হয়, তবুও যেহেতু কবরস্থানের কাজে ব্যবহার হচ্ছে না এবং প্রশ্নের বর্ণনামতে ভবিষ্যতেও তার প্রয়োজন হবে না, এভাবে উক্ত জমি খালি পড়ে থাকার কারণে অবৈধ দখলদারীর আশঙ্কা রয়েছে, সেহেতু এলাকাবাসীর সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে উক্ত জমি মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে। তবে ভবিষ্যতে কখনো দাফনের কাজে প্রয়োজন হলে সেখান থেকে মাদরাসার স্থাপনা সরিয়ে নিতে হবে। আর এজন্য কবরস্থানের জায়গা শর্তসাপেক্ষে মাদরাসার কাজে ব্যবহারের বিষয়টি লিখিত রেখে দিলে ভালো হবে। যেন ভবিষ্যতে এ নিয়ে দ্বন্দ্বের সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে।
উল্লেখ্য, উক্ত স্থানে মাদরাসার কোন অস্থায়ী ঘর-দরজা বানিয়ে টয়লেট ইত্যাদি মাদরাসার স্থানে বানাতে চেষ্টা করবেন। (ফাতহু যিল-জালালি ওয়াল-ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ৪/২৮১, উমদাতুল কারী ৪/১৭৯, আল-বাহরুর রায়িক ৫/৩৪২, আদ্দুররুল মুখতার ২/২৩৩, ৪/৩৫১, ৪৫৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৩/১৬৩, ১৪/১৭৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/৩১৭, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৪/৩২৪)


**- - - - - আবশ্যক - - - - -**

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার বিশেষ বোর্ডিংয়ের জন্য একজন ম্যানেজার ও বোর্ডিংয়ের স্টোরের জন্য একজন আমানতদার স্টোরকিপার আবশ্যক। আলেম হলে ভালো। রাহমানিয়ার ফারেগ হলে আরো ভালো।

**যোগাযোগ : ০১৭১১১৮০৩৮৯**

# ওলী হওয়ার সহজ পথ

## মুফতী আব্দুল বারী দা.বা.

*গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে 'আবনাউল আশরাফিয়া'-এর ৩য় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা, জামিয়া আশরাফিয়া সাইনবোর্ড, ঢাকা-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস মুফতী আব্দুল বারী দা.বা. প্রদত্ত বয়ান।*

হামদ ও সালাতের পর...

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে আজ এখানে একত্র করেছেন ইলমের খাতিরে, দীনের নিসবতে। তোমাদের জন্য পাওয়ার হাউজতুল্য এই জামি'আর বাগানের মধুমক্ষিকা ছিলে তোমরা। আজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছো দেশের আনাচে কানাচে। তো বছরের একটা দিন একত্র হলে সবার সাথে সবার মুলাকাত হয়। এটাই বা কম কী? উলামায়ে কেরামের যিয়ারতও ইবাদত। তো সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আজকে তোমরা এখানে একত্রিত হয়েছো। তোমাদের মুখগুলো দেখে খুব ভাল লাগছে। শোকর আল্লাহর! আলহামদুলিল্লাহ!!

**ইলমের সংজ্ঞা**

আমি তোমাদের সামনে যে আয়াতটি পাঠ করেছি-

انما يخشي الله من عباده العلماء.

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে এবং বড় আদর করে উলামাদের শানে বলেছেন, 'তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁকে কেবল উলামায়ে কেরামই ভয় করে।' এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী রহ. লিখেছেন, এ আয়াতে خشية ও علم এর মাঝে علة ও معلول এর সম্পর্ক। خشية হল علة আর علم হল معلول। নিয়ম আছে, علة কখনো তার معلول থেকে পৃথক হয় না, একটা অপরটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। অর্থাৎ যে علم এর মধ্যে خشية আছে, সেটাই আল্লাহর নিকট প্রকৃত ইলম, আর যে ইলমের মধ্যে خشية নেই আল্লাহর নিকট তা কোনো ইলমই নয়। সুতরাং যে আলেমের মধ্যে خشية আছে তিনিই আল্লাহর দরবারে প্রকৃত আলেম। যার মধ্যে এই خشية থাকবে না আল্লাহর নিকট সে প্রকৃত আলেম নয়।

**خشية এর ফায়দা**

خشية-ই মূল। আল্লাহর خشية ভয়-ভীতি থাকলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফলতা আর কামিয়াবী অর্জন করা যায়। আল্লাহর ওলী হওয়া যায়। কেননা خشية এর কারণেই সুন্নাতের اتباع হয়। আর সুন্নাতের ইত্তিবা দ্বারা ওলী হওয়া যায়। আর ওলী হতে পারলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আছে,

الا ان اولياءالله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون.

'শুনে রাখ! যারা আল্লাহর ওলী তাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তারও কোনো কারণ নেই।'

**ওলী কারা ?**

আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন,

الذين آمنوا وكانوا يتقون

ওলী হল তারা ..'সঠিকভাবে ঈমান আনে যারা, আল্লাহকে ভয় করে-তাকওয়া হাসিল করে যারা'। তাকওয়ার অর্থ হল-

امتثال الامر والاجتناب عن النواهي.

'পালনীয় বিষয়গুলো সুন্নাত তরীকায় মানা আর বর্জনীয় বিষয়গুলো বিলকুল বর্জন করা।' (তাফসীরে বায়যাবী) এরই নামই তাকওয়া। এই তাকওয়া যাদের মধ্যে আসে তারাই ওলী হয়। বুঝা গেল তাকওয়াই হচ্ছে আসল পুঁজি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ومن يتق الله يجعل له مخرجا

'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য সকল সমস্যার সমাধান বের করে দেন।' (সূরা তালাক : ২-৩)

আমরা চিন্তা করলে দুই ধরণের চিন্তা করে থাকি; ১. বিভিন্ন সমস্যার কারণে চিন্তা। ২. রিযিকের জন্য চিন্তা। এখন এ দু'টোর মধ্য থেকে রিযিকের চিন্তাও কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার চিন্তার মধ্যে শামিল। তারপরও রিযিকের কথা আলাদা উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, মানুষ রিযিকের জন্যই বেশি পেরেশানী উঠায়, বেশি পেরেশান হয়। টাকা ও খাবারের সমস্যাই মানুষের কাছে বড়। রিযিকের অভাবেই মানুষ চুরি, ডাকাতি, সুদ-ঘুষসহ যাবতীয় হারাম কাজে লিপ্ত হয়। যার দরুণ মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়, আখলাক খারাপ হয়ে যায়। অতএব তোমরা যদি রিযিকের পেরেশানী দূর করতে চাও এবং যাবতীয় সমস্যার সহজ সমাধান পেতে চাও তাহলে তাকওয়ার গুণ হাসিল করতে হবে। তাকওয়া হাসিল হয়ে গেলে সকল সমস্যার সহজ সমাধান পেয়ে যাবে। কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে, কী খাবে, সব দূর হয়ে যাবে। সুতরাং তাকওয়া অর্জনের পেছনেই মেহনত করতে থাক। টাকার পেছনে দৌড়ালে পেরেশানী দূর হবে না। সকল সমস্যার হল্ল আসবে না। এ সব কিছুর সমাধান আর হল্ল একমাত্র তাকওয়া অর্জনের মধ্যে পাওয়া যায়। রিযিকের গোড়া হল তাকওয়া। অতএব তাকওয়া অর্জন কর। সকল প্রকার গুনাহ ছাড়। সুন্নাতের উপর চল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من احب سنتي فقداحبني ومن احبني كان معي في الجنة.

'রাসূলকে ভালবাসার সোজা পথ, রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ। তার সাথে জান্নাতে যাওয়ার সোজা পথ, ইত্তেবায়ে সুন্নাত'।

বুঝা গেল রাসূলের সাথে জান্নাতে থাকতে হলে সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য। এর দ্বারা তাকওয়া হাসিল হবে। আর তাকওয়ার কারণে সব কিছুই আমাদের হাতে চলে আসবে। যে রিযিকের জন্য আমরা দিবানিশি পেরেশানী উঠাই সে রিযিকের অভাবও দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

**রিযিক কী ?**

আল্লামা কাযী বাইযাবী রহ. বলেন, রিযিক হল ما ينتفع به 'যে জিনিসের দ্বারা ফায়দা উঠানো যায়' তার সবই রিযিক। এর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, পোশাক-আশাকসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর সবই আল্লাহ তা'আলা ব্যবস্থা করে দিবেন। তোমার চিন্তায়ও ধরবে না যে, কোত্থেকে তা আসছে। সুতরাং তাকওয়া অবলম্বন কর। রিযিকের ব্যবস্থা তিনিই এমন জায়গা থেকে করবেন, যার চিন্তা করতে গেলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।

ويرزقه من حيث لايحتسب

'এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।' এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ আছে? না..কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? কেননা

ومن اصدق من الله قيلا.

'আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে'? দেখবে এই ওয়াদা মোতাবেক এমন অবস্থা হবে যে, তোমার প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তুমি কিছুই টের পাবে না। কিন্তু আল্লাহ তোমার দ্বারাই সব করাবেন। তোমাকে ব্যবহার করবেন, তোমাকে কাঁদাবেন, তোমার চোখের পানি ফেলাতে ফেলাতে কাজ নিয়ে নিবেন।

**চোখের পানি ফেলো!**

মনে রাখবে, আল্লাহর দরবারে চোখের পানি বড় পছন্দের জিনিস, বেশ দামী জিনিস। চোখের পানি ছাড়া কিছুই হয় না। চোখের পানি ছাড়া কোন জিনিসের সমাধান হয় না। পক্ষান্তরে চোখের পানির দ্বারা অনেক কিছুরই সমাধান পাওয়া যায়। এজন্য যখনই কোন পেরেশানী আসে দুই রাকআত সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে চাইবে। চোখের পানি ফেলে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে তোলো, দেখবে আল্লাহ দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। কারণ তার কাছেই তো রয়েছে সব কিছুর খাযানা, যা কেবল আমাদেরই জন্য, তার তো কোনো কিছুর দরকারই নেই। তাই যত রিযিক আমাদের প্রয়োজন তা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। এ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল করে নিতে পারলে আর বড় লোকদের পেছন পেছন দৌড়াতে হবে না।

**ইলমকে যলীল করো না**

ইমাম বুখারী রহ. এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বাব (অধ্যায়) লিখেছেন। যার সারাংশ হল, ইলমকে যলীল–অপদস্ত করো না। অর্থাৎ ইলম শিখে পয়সাওয়ালাদের পিছনে দৌড়ে, তাদের জুতা উঠিয়ে নিজেকে এবং নিজের ইলমকে যলীল করবে না, উলামায়ে কেরামকেও অপমান করবে না। তুমি বরং যে কোন হাজতে আল্লাহর কাছে হাত উঠাও, তার কাছেই চাও, দেখবে দেয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। আসলে দেনেওয়ালার অভাব নেই, লেনেওয়ালারই অভাব। তোমরাই বল, আল্লাহর কাছে কোন কিছুর অভাব আছে? আল্লাহ كن বললেই তো সব হয়ে যায়।

إذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.

তিনি কিছুর ইচ্ছা করলে كن বললেই হয়ে যায়।' এক কোটি টাকার প্রয়োজন? আল্লাহ كن বললেই এসে যাবে। কিভাবে আসবে বুঝতেও পারবে না। আল্লাহর কাছে এক কোটি আর এক টাকা সবই সমান। কোন পার্থক্য নেই। এক টাকাও كن দ্বারা আসে। লক্ষ-কোটি টাকাও كن দ্বারাই আসে। সুতরাং যা কিছু চাওয়ার আল্লাহর কাছেই চেয়ে নিবে।

**গনীমত মনে করো**

বাবারা! মাদরাসার খেদমতও একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা চাই। যার কাছে সব কিছুর খাযানা, তাকেই রাজি করে নাও, সব পেয়ে যাবে। যারা দরস-তাদরীসের খেদমতে লাগতে পেরেছো, এটাকে গনীমত মনে কর। আমি তো এই দু'আ করি যে, যত ছাত্র ফারেগ হয়েছে এবং যারা ফারেগ হচ্ছে বা হবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে দীনের খাদেম বানান। আল্লাহ যেন একশ'র মধ্যে একশ'কেই তাঁর ওলী বানিয়ে নেন। সব সময়ই আমি এই দু'আ করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মাদরাসার ফারেগীনদের সকলকেই দেখলাম, মাশাল্লাহ দীনের খেদমতে আছে। এটা আল্লাহর বড় ফযল ও করম। অতএব তোমরা দীনের কোন খেদমতকেই ছোট মনে করো না। তুমি হেদায়াতুন্নাহব পড়াও, বুখারী শরীফ পড়াতে পারছো না এজন্য মন খারাপ করো না। মনে রাখবে, তুমি যদি ইখলাসের সঙ্গে হেদায়াতুন্নাহব বা যে কোন ছোট কিতাবই পড়াও আর কেউ বুখারী শরীফ পড়ায় আমিত্ব দেখানোর জন্য তাহলে তুমিই তার চেয়ে উত্তম, তুমিই তার থেকে অনেক বড়। নূরানী বা হেফজখানায় পড়াও, মন ছোট করো না। কারণ আমি তো বলি, যারা নূরানী বা হেফজখানায় পড়ায় তারা বড়ই ভাগ্যবান। শুধু তা-ই নয়, তারাই প্রথম সারির ভাগ্যবান। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خيركم من تعلم القران وعلمه

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি (এখলাসের সাথে) কুরআন শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন।' ইবতিদায়ী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত, এমনিভাবে আদব, ফুনূনাত, ইফতা, উলূমুল হাদীস বা তাফসীর এগুলোর মধ্যে কুরআন আছে বিল ওয়াসেতা বা ভায়া হয়ে। পক্ষান্তরে সরাসরি কুরআন আছে কোথায়? মকতবে, নাযেরায় আর হেফযখানায়। হেফয না পড়লেও কমপক্ষে মক্তব পড়া ছাড়া বা কুরআন শরীফ পড়া ছাড়া কেউ আলেম হতে পারে? পারে না। আর হাফেয সাহেবদের কথা কী বলব! হাঁটতে, বসতে, শুইতে সব সময় কুরআন তাদের সাথে থাকছে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হয়তো পড়ছে নয়তো শুনছে, কুরআন ছাড়া তারা থাকতেই পারছে না। এমনকি এটা ছাড়া তাদের অন্য কোন কাজের সুযোগও নেই। কেউ যত বড় আলেমই হয়ে যাক ফাউণ্ডেশন কাদের হাতে গড়া? আপনাদের হাতে গড়া। অতএব মন ছোট করার কোন কারণ নেই।

**হাফেযদের সাথে পারা যায় না**

হাদীস শরীফে এসেছে,

من قرأالقران حرفا فله عشر حسنات

'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়।' সুতরাং নেকী কামাইয়ের ক্ষেত্রে বা ইবাদত করে হাফেজ সাহেবের সঙ্গে কে পাল্লা দিতে পারবে? এজন্য আমি বলি, 'হাফেজদের সঙ্গে ইবাদত করে পারা যায় না।' তবে শর্ত হচ্ছে ইখলাস। ইখলাস না থাকলে এ সকল মেহনত বিফলে যাবে। আপনাদের এই যে এত সম্মান নবীজী দিয়ে গেছেন এগুলোর উপযুক্ত হতে হলে শর্ত হল ইখলাসের সঙ্গে খেদমত করতে থাকা। ইখলাস না থাকলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং ইখলাসের সঙ্গে নূরানী-নাযেরা আর হেফজখানার খেদমতকে ছোট মনে করা যাবে না। বরং এটাকে গনীমত মনে করতে হবে। অনেকে আছে, যদি জিজ্ঞেস করি, কী কর? একেবারে ছোট হয়ে বলে, হেফজখানায় পড়াই! তার হাবভাব দেখে মনে হয়, হেফজখানায় পড়ানোর খেদমত করে না জানি সে কতটা ঠকে গেছে? মক্তবের কথা বললে তো আরো ছোট হয়ে যায়। এমনটি না হওয়া চাই।

**মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ যানযানাবী রহ.**

মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ যানযানাবী রহ.-এর নাম তো সবাই শুনেছো নিশ্চয়ই। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর পীর ছিলেন। হাজী সাহেব বাইয়াত হবেন কার কাছে এ নিয়ে খুব চিন্তা করছিলেন। আর মনে মনে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটিকে তালাশ করছিলেন। একরাতে স্বপ্নে দেখেন, এক মজলিসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। পাশে মিয়াঁজী নূর মুহাম্মদ ও অন্যান্য আরো কয়েকজন উপস্থিত। নবীজী তাকে মিয়াঁজী নূর মুহাম্মদ-এর দিকে ইশারা করে বলছেন, এর কাছে বাইয়াত হও! এটা তো ছিল স্বপ্নের কথা। কিন্তু কে এই ব্যক্তি, কোথায় থাকেন, কিভাবে পাওয়া যাবে কিছুই জানা ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু এই চেহারার মানুষটিকে পেলেন না। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন এমন চেহারার এক ব্যক্তিকে আমি খুঁজছি, তিনি কে? কোথায় পাওয়া যাবে? ঐ ব্যক্তি চেহারা ও দেহাবয়বের বর্ণনা শুনে বললেন, আমার জানামতে মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ নামে এক লোক আছে, আপনার বর্ণনা মোতাবেক সে-ই হবে মনে হয়। তার কথা শুনে হাজী সাহেব যানযানার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। চলতে চলতে একপর্যায়ে হযরত যানযানাবী রহ.-কে পেয়ে গেলেন। তিনি হযরত যানযানাবীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ

রেখে সামনে এগোচ্ছিলেন। কাছাকাছি হওয়া মাত্রই হযরত যানযানাবী তাকে বলতে লাগলেন, স্বপ্নকে আবার এত গুরুত্ব দিতে হয় নাকি? স্বপ্নে দেখে পাগল হয়ে গেছো? হাজী সাহেব তাজ্জব বনে গেলেন যে, স্বপ্নের কথা তিনি জানলেন কিভাবে? কার সাথে তার সম্পর্ক? কে তাকে জানাল? বস্তুত তার সম্পর্ক তো ছিল আল্লাহর সঙ্গে। তিনিই তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইমদাদুল্লাহ স্বপ্নে দেখেছে, তোমার কাছে বাইয়াত হবে এবং এজন্য সে তোমার কাছে আসছে। মোটকথা হাজী সাহেব আশ্চর্য হলেন এবং তার দিল আরো প্রশান্ত হল। অবশেষে তার কাছে বাইয়াত হলেন এবং পরবর্তীতে তার খেলাফত লাভেও ধন্য হলেন।

হযরত নূর মুহাম্মাদ যানযানাবী রহ. মক্তবে পড়াতেন বিধায় তাকে মিয়াঁজী বলা হত। এবার চিন্তা করে দেখ, মক্তবে পড়ানো কোন ছোট পদ নয়, বরং অনেক বড় পদ। কারণ আমাদের মুরুব্বীদের মুরুব্বী মক্তবে পড়াতেন। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. মক্তবের বড় আশেক ছিলেন। কোথাও মক্তব কায়েম হয়েছে জানতে পারলে দৌড়ে যেতেন। নূরানী হোক নাদিয়া হোক সবখানেই যেতেন। কারণ নূরানীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা বেলায়েত হুসাইন সাহেব রহ. আর নাদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব রহ. উভয়েই হযরত হাফেজ্জী হুযূরের খলীফা ছিলেন। হুযূর তাদেরকে মক্তবের খেদমতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

অতএব বাবারা! যারা মক্তবে খেদমত করছো নিজেকে ছোট মনে না করে হুশিয়ার থাক। মরা মানুষের মত চুপ করে বসে না থেকে বরং মজবুতভাবে পড়াতে থাক। প্রয়োজনে দশটা ট্রেনিং গ্রহণ করবে। ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে মু'আল্লিমুল মু'আল্লিমীন হয়ে যাবে। এভাবে মজবুতির সঙ্গে মক্তব চালাতে পারলে দেখবে দাওরা পর্যন্ত মাদরাসার যে সুনাম, তোমার মক্তবেরও সেই সুনাম অর্জিত হবে। দাওরা পর্যন্ত মাদরাসার দ্বারা যে ফায়দা হবে, তোমার মক্তবের দ্বারাও সেই ফায়দা হবে।

**বেশভূষা ঠিক রেখো**

বুযুর্গানে দীনের তরীকা ছেড়ো না। তাদের লেবাস ছেড়ো না। আফসোস! কোন কোন ছাত্র মাদরাসার পরিবেশে ছিল একরকম, এখন দেখা যায় অন্য রকম। তারা ইজতিহাদ করে। তোমরা ইজতিহাদ করতে যেও না। কেউ কেউ জামা-টুপি বদলে ফেলে। তোমরা করবে না। আমরা যে পাঁচকল্লি টুপি মাথায় দেই এটা হযরত থানভী রহ.এর পসন্দীদা তরীকা। এটা ফরজ-ওয়াজিব নয় যে, এটাই পরতে হবে। আর দুইকল্লি বা কিস্তি টুপি হযরত মাদানী রহ.-এর তরীকা। এটা তিনিও পরতেন এবং তার মুরীদরাও পরে থাকেন। টুপি যেটাই হোক যদি মহব্বতের সঙ্গে মাথায় দেয়া হয় তাহলে বরকত পাওয়া যাবে। আর যদি লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে হয় তাহলে কেয়ামতের দিন তা আগুনের টুপিতে রূপান্তরিত হবে।

**প্রয়োজনীয় শান-শওকতও থাকা চাই**

উলামায়ে কেরামের শান-শওকত থাকা চাই। এটা ইখলাসের পরিপন্থী কিছু নয়। বরং এটা আরো বেশি পছন্দনীয় কাজ। ইখলাসের সাথে ইলমের মান রক্ষার্থে শান-শওকত থাকতে পারে। তবে নিয়ত বিশুদ্ধ থাকতে হবে। তাহলে সাওয়াবও পাওয়া যাবে। আমাদের আকাবিরদের মধ্যে এর বহু নযীর আছে। শুধু একজনের কথা বলি, হযরত ইমাম মালেক রহ. যখন দরসে বা কোন ইলমী মজলিসে যেতেন তখন গোসল করতেন। ভাল পোশাক পরিধান করতেন। আতর-সুগন্ধি লাগাতেন। এরপর শাহী আন্দাযে মসনদে তাশরীফ নিতেন। তাদের নিয়ত দুরস্ত ছিল বিধায় তারা বরকত পেয়েছেন। সুতরাং আমরাও যদি শান-শওকত অবলম্বন করতে চাই তাহলে বিশুদ্ধ নিয়তে করতে হবে। আলেমদের মরা-মুর্দার ন্যায় চলা উচিত নয়। বরং বুকের মধ্যে বল নিয়ে চলতে হবে।

**গোপন গুনাহও ছাড়তে হবে**

যাই হোক, তোমরা সব ফিকির ছেড়ে দিয়ে এক ফিকির ধর। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের ফিকির কর। সব কাজে সুন্নাতের অনুসরণ কর। আর একটা গুনাহও করবে না। বিশেষ করে চোখের গুনাহ, মুখের গুনাহ এবং লজ্জাস্থানের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। অনেকে আছে স্বাভাবিক গুনাহ করে না। কিন্তু বাতেনী গুনাহ করতে থাকে। সেগুলোও ছাড়তে হবে।

১. 'বদ নযর'। বদ নযর যেমনিভাবে পর-নারীদের দিকে হয়। এক্ষেত্রে অনেকে বিবাহ করেও কুদৃষ্টি করে, অনেক বিবাহ না করেও কুদৃষ্টি করে। মহিলারা সামনে এলেই দেখতে মনে চায়। আসলেই দেখতে মনে চায়। আলেম মানুষ চুপে চুপে দেখে যেন মানুষ দেখে না ফেলে। তাই হিম্মত করবে যে, বিশ্বসুন্দরী সামনে আসলেও তাকাব না। কারণ বিশ্বসুন্দরীর চেয়ে বেশী সুন্দরী হবে জান্নাতী হুর। বিশ্বসুন্দরীর চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হবে তারা। বিশ্বসুন্দরী তো গান্ধা-পঁচা। এখন তার রুপ আছে। কয়েকদিন পর তার গাল ভেঙ্গে যায়। এদিক দিয়ে লালা পড়ে ওদিক দিয়ে লালা পড়ে। দেখতেও বিশ্রী দেখায়। তখন কেউ তাকে দেখতেও চায় না। পক্ষান্তরে জান্নাতের হুরগণ হবে মুতাহ্হারাত–পবিত্র। যাদের রুপ-লাবণ্য দিন দিন বাড়তেই থাকবে। সুতরাং যত কিছুই সামনে আসুক চোখ উঠিয়ে তাকাবে না। নিজে না পারলে শাইখের শরণাপন্ন হবে। তাহলে আশা করা যায়, দুনিয়ার হুরের প্রতি বদ নযর থেকে বাঁচার কারণে জান্নাতী হুরের মালিক হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

তেমনিভাবে আমরদ–দাড়িবিহীন সুশ্রী বালক-বাচ্চাদের দিকেও বদ নযর হয়। তাই তাদের থেকেও নযর হেফাজত করতে হবে (কোনো প্রয়োজনে তাদের দিকে তাকাতে হলে চোখ খুলে ভাল করে তাকাবে না। বরং ভাসা-ভাসা নযরে তাকাবে)। কেননা এটা এমন গুনাহ যা সবার সামনে হলেও কেউ টের পায় না। হাদীসে এটাকে 'বিষাক্ত তীর' বলা হয়েছে। বিষাক্ত তীর লাগলে যেমনিভাবে মানুষ মরে যায়। তদ্রুপ 'বদ নযর'ও কলবকে মেরে ফেলে। আমলের নূর খেয়ে ফেলে। এর দ্বারা অন্যান্য গুনাহের দ্বার খুলে যায়। তাই যত কষ্টই হোক নযর হেফাজত করতে হবে। এটাকে হেফাজত করতে পারলে হাদীসে বলা হয়েছে,

وجد حلاوة الإيمان

'ঈমানের স্বাদ পাওয়া যাবে।' আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের স্বাদ নসীব করুন।

২.গালি-গালাজ করা। যে কাউকেই হোক গালি দেয়া ভালো কাজ নয়। এটা মুনাফিকের কাজ। হাদীসে পড়েছো

سباب المسلم فسوق

'কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী' কাজ। যা মুনাফেক হওয়ার একটা আলামত। সুতরাং তলেবে ইলেমদেরকেও কখনো গালি-গালাজ করবে না।

৩. আরো কিছু গুনাহ মুখের দ্বারা হয়ে থাকে। যেগুলো করতে খুবই ভাললাগে। ঘি দিয়ে ভাত খেলে যেমন মজা লাগে তদ্রুপ মুখ দিয়ে এ গুনাহগুলো করতেও খুব মজা লাগে। যেমন : গীবত, শেকায়েত, চোগলখুরী, কূটনামী, অন্যের দুর্নাম-বদনাম ইত্যাদি। অথচ কুরআনের ভাষায় এগুলোকে মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান বলা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

**গুনাহের উৎপত্তিস্থল**

যে সমস্ত গুনাহের আলোচনা হল এগুলোর উৎপত্তি স্থল দু'টি; ১. দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান তথা পুরো

চেহারার অন্তর্গত চোখ, মুখ ইত্যাদি। ২. দুই রানের মধ্যবর্তী স্থান তথা লজ্জাস্থান। এগুলো হেফাজত করতে পারলে নবীর বাণী হল

من يضمن لي مابين لحييه ومابين رجليه اضمن له الجنة

'যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান ও দুই রানের মধ্যবর্তী স্থানকে হেফাজতের গ্যারান্টি দিতে পারবে আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিচ্ছি।' অতএব চোখ ও মুখের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখ। চোখ কোথায় যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখ। মোটকথা তোমরা পরিপূর্ণ সুন্নত তরীকায় চল। সকল রকম গুনাহ বর্জন কর। তাকওয়া হাসিল কর। দেখবে, সম্মান তোমার খুঁজে বেড়াতে হবে না, সম্মানই তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে।

**সম্মান কীসে**

তুমি শুধু তাকওয়া-খোদাভীতি তালাশ কর। এতেই চারদিক থেকে সম্মান আসতে থাকবে। সকলেই তোমাকে সম্মান করবে। সম্মান তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ কোন বান্দাকে মহব্বত করলে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলে দেন, অমুক বান্দাকে আমি মহব্বত করি, তুমিও তাকে মহব্বত কর। অতঃপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসমানের সকল ফেরেশতাকে বলে দেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে মহব্বত করেন তাই আমিও তাকে মহব্বত করি, অতএব তোমরাও তাকে মহব্বত কর। এভাবে সমগ্র পৃথিবীতে তার ডংকা বাজিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরাও তাকে মুহাব্বত কর। আল্লাহর ওলীদেরকে মানুষ যে মুহাব্বত করে এটা এমনি এমনিই করে? কিংবা তারা কি পোস্টার সাঁটিয়ে দেয় যে, আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসো!? হক্কানী পীর বুযুর্গরা কি কখনও এগুলো করে? করে না। তারপরও তাদের জন্য মানুষ এত পাগল কেন? বস্তুত মহব্বত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহর পক্ষ থেকেই সব ফায়সালা হয়। হাওলাতী ইজ্জত-সম্মানের কোন প্রয়োজন নেই। তাকাল্লুফী করে বানোয়াটিভাবে ইজ্জত কামাই করাকে হাওলাতী ইজ্জত বলা হয়। অনেকে বয়ান করতে বসলে নানা রঙ-ঢং আর অঙ্গভঙ্গির আশ্রয় নেয়। মানুষকে দেখায় যে, আমি খুব বড় বক্তা। এভাবে ইজ্জত তালাশ করার নামই হাওলাতী ইজ্জত। এগুলো স্থায়ী হয় না। এই ওয়াজ দ্বারা মানুষের হেদোয়াত হয় না। এই ওয়াজ মানুষের দিলে আছর করে না। (৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

=====================

**(৫ পৃষ্ঠার পর; শিরকমুক্ত ঈমান ...)**

তো আখেরী চাহার শোম্বা ছিল মুসলমানদের দুঃখের দিন। কারণ, এদিন নবীজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে যে পরিমাণ মহব্বত করতেন, অনুমান করা যায় এতে তারা পেরেশান হয়েছেন, কান্নাকাটি করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই দিনটিকে বানিয়েছি আনন্দের দিন! কেউ খিচুড়ি রান্না করে বিতরণ করছে, কেউ মিষ্টি বিতরণ করছে, কেউ টাকা-পয়সা বিতরণ করছে। যার যা ইচ্ছা করছে। মোটকথা, দুঃখের দিনকে খুশির দিন বানানো হয়েছে। আবার ঘটা করে ছুটি পালন করা হচ্ছে। এটা কত বড় জাহেলিয়্যাত, কত বড় মূর্খতা! এদিনে ছুটি পালন করার কী আছে? এটা তো চরম দুঃখের দিন। নবীজী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এই দিনে এবং সেই অসুস্থতা থেকে আর সুস্থতা লাভ করেননি। হ্যাঁ, ইন্তিকালের আগে সোমবারে সামান্য সুস্থ হয়েছিলেন। এরপর আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তো পুরো বিষয়টাকে উল্টে দেয়া হয়েছে। এর ভিত্তি জাহেলিয়্যাতের উপর, গলদ আক্বীদার উপর। রাসূলের মুসীবতের দিনকে ঈদের দিন বানানো হয়েছে, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে?

রাসূলের মুসীবতে আনন্দিত হওয়া তো ইয়াহুদীদের কাজ। তবে আজকে আর ইয়াহুদী লাগছে না; এখন এটা আমরাই করে দিচ্ছি। এখন আর মুহাররমের মিছিল বের করতে শিয়া লাগছে না। এখন আর পূজা করতে হিন্দু লাগছে না। মুসলমানরাই গিয়ে পূজাটা পালন করে দিচ্ছে। সব ধর্মের দায়িত্ব এখন মুসলমানরা কাঁধে নিয়েছে। খ্রিস্টানদের বড়দিনও মুসলমানরা পালন করে দিচ্ছে। হিন্দুদের পহেলা বৈশাখও পালন করে দিচ্ছে। থার্টিফাস্ট নাইট! এটাও খ্রিস্টানদের তরীকা এবং এটাও মুসলমানরা করে দিচ্ছে।

মুসলমানরা ইসলাম ছাড়া আর যা যা ছিল, সবগুলো পালনের দায়িত্ব নিয়েছে। শুধু ইসলামেরই দায়িত্ব নেয়নি। যত ঈমান বিধ্বংসী কাজ ছিল, সবগুলোর দায়িত্ব আমরা বুঝে নিয়েছি। যে মুসলমান ইসলামের দায়িত্ব নেয়নি, ইসলাম শিখেওনি, কুরআন পড়তে জানে না, কুরআনের অর্থ বোঝে না, কুরআন শেখার পথেই সে হাঁটেনি, পক্ষান্তরে যত নাজায়েয কাজ, বিধর্মীদের কাজ সব দায়িত্ব সহকারে পালন করছে এমন মুসলমানের উপর গযব পড়বে না, তো রহমত নাযিল হবে?

শুধু তা-ই নয়, মুসলমান নিজেই আজ ইসলাম নিয়ে উপহাস করছে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে। বলা হচ্ছে, ইসলাম মানেই জঙ্গিবাদ, মুসলমান মানেই সন্ত্রাস, মাদরাসা মানেই জঙ্গিবাদের আখড়া। কাফেররা তো বলেই, মুসলমানরাও এখন এ ধরণের জঘন্য কথা উচ্চারণ করছে। এখন এই মুসলমানের উপরে আল্লাহর আযাব-গযব নাযিল হওয়াটা তো খুবই স্বাভাবিক। এরা যে এখনো আল্লাহর যমীনে টিকে আছে, এটাই তো আল্লাহর খাস মেহেরবানী।

এই হাদীসে আরেকটি কথা আছে– لا هامة। এই هامةশব্দের কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখা হল, জাহেলীযুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল, সন্তান প্রসবকালীন যেসব মহিলা ইন্তেকাল করে তারা পাখি হয়ে যায়। পাখি হয়ে বিভিন্ন ভীতিকর আওয়াজ করতে থাকে। এটা জাহেলিয়্যাতের একটা বিশ্বাস। আরেকটি ব্যাখ্যা হল, অনেকে মনে করে, তাদের যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন মরে গেছে, তাদের রূহ মাঝে-মধ্যে তাদের বাড়িতে আসে এবং তাদের জন্য কি কি করা হচ্ছে, না হচ্ছে এগুলো প্রত্যক্ষ করে। কাজেই ঐ রূহ তাদের ঘরে আসছে মনে করে তারা রাতের বেলা বাইরে পানি ফেলে না। ঘর ঝাড়ুও দেয় না। কারণ এই পানি নাকি ঐ মুর্দার গায়ে লাগবে! এটাও একদম গলদ কথা। কেননা কারো রূহ ইল্লিয়্যীনে বা সিজ্জীনে চলে গেলে সেখান থেকে ফিরে আসার কোন অনুমতি নেই। তো 'হামা নেই' বলে উক্ত জাহেলী বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে যে, ইসলামে এমন কোন বিশ্বাসের অস্তিত্ব নেই। বরং এরকম মনে করা কুফরী কাজ, শিরকী কাজ।

সারকথা হলো, এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি কুফরী-শিরকী আক্বীদা তুলে ধরেছেন। ঈমানকে বিশুদ্ধ রাখতে হলে এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না।

আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

**পরিমার্জন : মাওলানা সা'দ আরাফাত**
**শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা।**
**অনুলিখন : মাওলানা আব্দুল্লাহ ইউসুফ**
**ইফতা (২য় বর্ষ), জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া**

# কিশোর প্রতিভা

## খুব ইচ্ছে হয়!

নীরব-নিস্তব্ধ রজনী। রাতজাগা প্রাণীগুলোও কেমন যেন শান্ত। দূরে থেমে থেমে ডেকে যাচ্ছে ভয়ার্ত নিশাচর। কর্মক্লান্ত মানুষেরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রাস্তা একদম ফাঁকা। শোঁ শোঁ শব্দ তুলে দ্রুত চলে যাচ্ছে প্রাইভেট গাড়িগুলো। বিদ্যুতের খাম্বায় নিভু নিভু আলো নিয়ে ঝুলছে সোডিয়াম লাইট। আমি বাসা থেকে রাস্তায় নেমে এসেছি। ভীতু ভীতু পায়ে স্টেশনের দিকে চলছি। স্টেশনে মানুষের অতোটা ভীড় নেই। বেঞ্চগুলো নিথর পড়ে আছে। ট্রেন আসতে এখনো ঢের বাকি। বসে বসে আনমনে 'রাবেতা' পড়ছি। এমন সময় কাতর, ক্ষীণ একটি কণ্ঠ কানে আসল; 'ভাইজান! ভাইজান!! আমারে কয়ডা ট্যাহা দ্যান, আইজ হারাদিন কিচ্ছু খাই নাই।' আওয়াজটা শুনেও না শোনার ভান করলাম। ভাবলাম, এমন তো কতোজনই হাত পাতে!

আমি অনড় বসে পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে চলছি। আবার সেই ব্যাকুল কণ্ঠটা আরো করুণ হয়ে কানে বাজল। এবার ঘুরে তাকালাম। একটু দূরেই দুর্বল, ক্ষীণকায় একটি শিশু দাঁড়িয়ে আছে। ময়লা আধখোলা হাতটি প্রসারিত করে অপেক্ষা করছে। ওর ফ্যালফ্যাল চোখের অসহায় চাহনিতে তখন যন্ত্রণা ঝরে পড়ছে। পানি ভর্তি পাত্র নাড়া দিলে যেমন দলকে ছলাৎ করে ওঠে তেমনি আমার ভিতরটাও ছলাৎ করে ওঠল। ওর ওই চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি আর কিছুই ভাবতে পারিনি; সাধ্যমত ওকে উজাড় করে দিলাম। খুশিতে ওর চেহারাটা তখন ঝলমলিয়ে উঠল। মনে হল সূর্যটা হেসে উঠেছে। মলিন মুখে হাসি তুলে কখন যে সে মিলিয়ে গেল, আমি বুঝতেই পারিনি। তবে ওর হাসিটা তখনও ভাসছিল চোখে। ওই হাসি আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি। অমন একটা হাসি বুকে চেপে নির্দ্বিধায় দুঃখ ভুলে থাকা যায়। ওদের জীবনে এমন হাসির মুহূর্ত খুবই দুর্লভ। এমন একটি মুহূর্তের জন্য ওদের বেশ অপেক্ষা করতে হয়। বহু রাত পেরিয়ে ভোর করতে হয়। তবুও সে সুযোগ ওদের হয় না। কতো যে ধুর... ধুর..., কটমট চাহনি আর তাচ্ছিল্য ভরা গালমন্দ সহ্য করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। আমার খুব ইচ্ছে হয়, যদি পারতাম ওদের সবার মুখে প্রতিনিয়ত এমন নির্মল হাসি ফুটিয়ে তুলতে। ওদের কান্নাগুলো হাসিতে ভরে দিতে।

যদি পারতাম ওদের জন্য এমন এক ভুবন গড়ে তুলতে যেখানে ওরা কখনো প্রত্যাখাত হবে না, ক্ষণে ক্ষণে শুধুই আনন্দ আর তৃপ্তি ঝলমলিয়ে উঠবে। আমার খুব ইচ্ছে হয় এমন। এবং খুবই। আল্লাহ তুমি এমন করে দিও।

**নিয়ামুল হক ইউসুফ**
**জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ মাদরাসা, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা**

## গ্রীষ্মের ভরদুপুরে

গ্রীষ্মের ভরদুপুরে রিক্সার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দু'দিন ধরে প্রচণ্ড গরম পড়ছে। রোদ তো নয়, আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। দরদর করে ঘামছি। গেঞ্জি তো আগেই ভিজেছে, জামাটিও তথৈবচ। পিপাসায় ছাতি ফাটেফাটে অবস্থা। এমন সময় একজন বয়স্ক রিক্সাচালক এগিয়ে আসলেন। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। ঘেমে-নেয়ে একাকার। স্নেহমাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন বাবা? গন্তব্যের কথা বললাম। বললেন, জলদি উঠে বসেন, রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে! উঠে তো বসলাম, কিন্তু মনের মধ্যে খচখচানি শুরু হল– পিতার বয়সী একজন লোককে এমন আগুনঝরা দিনে কীভাবে কষ্ট দিই! শুধু আজকেই নয়, রিক্সায় উঠলেই আমার এই অস্বস্তি শুরু হয় যে, একজন মানুষ আরাম করে বসে আছে, আর আরেকজন মানুষ তাকে কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে! তবে আজকের অস্বস্তিটা আরও তীব্র। যা হোক, কিছুক্ষণ চলার পর কৌতূহল বশত জিজ্ঞেস করলাম, চাচা! আপনার ছেলেপেলে নেই, এই জানমারা গরমেও রিক্সা চালাতে বাধ্য হচ্ছেন? তিনি কিছুক্ষণ পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আর বলবেন না বাবা, ছিল একটা ছেলে। বিয়ে-শাদী করে নিজের সংসার নিয়েই থাকে। আমাদের কোন খোঁজ-খবর নেয় না। ওটা ছাড়াও আমার কয়েকটি মেয়ে সন্তান আছে। তাদের মুখের দিয়ে চেয়ে এই বয়সেও রিক্সার হাতল ধরতে হয়। চাচার কথায়, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় শোনা একটি কবিতা– 'এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি।'

গন্তব্যে নেমে দু'গ্লাস ফিল্টার পানির দাম হাতে রেখে আমার গরীবানা পকেটের সবটুকু চাচার হাতে তুলে দিলাম। নিতে চাচ্ছিলেন না, তাই একপ্রকার জোর করেই তার ঘামে ভেজা বুকপকেটে রেখে দিলাম, যে বুকের ভেতর অনবরতই চলছে বেদনার রক্তক্ষরণ!

**আহমাদ বিন আলী**
**জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মপুর, ঢাকা।**

## প্রিয় মা!

প্রিয় মা! তোমাকে সালাম দিয়েছি, শুনেছো তুমি? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কি? কেমন আছো মা? জানি, হাজার কষ্টে থাকলেও কখনো বলবে না– আমি ভালো নেই। ছোটো বেলা থেকেই বুঝতে পারি, তুমি অনেক মিথ্যা বলো। কিন্তু জানো মা, অমন করো বলেই তোমাকে এত্তো ভালবাসি।

আমি ভালো আছি মা। শুধু বার বার তোমার কথা মনে পড়ে। মনটা কেমন ছটফট করে ওঠে। সেই কবে কনকনে শীতে জবুথবু হয়ে আমার চলে আসা দেখছিলে, জানো মা, সেই যে তোমায় শেষবার দেখেছি তারপর আজ কতোদিন তোমায় দেখি না।

জানো মা, প্রায়ই মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। অনেকের মাঝে শুয়ে থেকেও নিজেকে খুব একা একা মনে হয় তখন। চোখ বুঝে তখন পড়ে থাকি। আর ঘুম আসে না। কেবলই মনে হয়, যদি একছুটে তোমার কাছে চলে যেতে পারতাম।

রাইহানা, মাহমুদ কেমন আছে মা? ওরা মাদরাসায় যায় তো নিয়মিত? জানো মা, এখনো রোজ যত্ন করে ওদের জন্য টাকা ভাংতি করে রাখি। ওদের তো আর দিতে পারি না, টাকাগুলো ব্যাগের পকেটেই পড়ে থাকে। বাড়িতে এসে সব একসাথে দিয়ে দিবো দু'জনকে। আজ কতোদিন হলো, ওদের ভাইয়া ডাক শুনতে পাই না। জানো তুমি! অমন করে আমাকে কেউ আর 'ভাইয়া' ডাকে না।

আমার কদম চারাটা কতটুকু বেড়েছে মা? মাহমুদের সমান না রাইহানার? দুধ-মরিচ গাছটায় কি ফুল ফুটেছে? দেখে রেখো, কেউ ছিঁড়ে না ফেলে। আমি আসছি মা, এই তো আর বেশি দেরি নেই। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিন। তবে সময়গুলো বড় ধীরস্থির। এগোতেই চায় না।

আজ এ পর্যন্তই। চিঠির উত্তর দিও। যাই মা, সবার খাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভাত খাবো। এখানে তো আর তুমি নেই যে, আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে। দেরিতে গেলে একা একা খেতে হবে। তুমি তো জানোই, একা আমার একদম ভালো লাগে না। আরেকটা কথা মা, খেতে বসলেই শুধু তোমার কথা মনে পড়ে। কতোদিন হলো তোমার হাতের রান্না খাই না।

**ইতি, তোমার ছেলে– নাজমুল হাসান**
**তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

## একটি ঘোষণা!

কিশোর বন্ধুরা! ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি? কিশোর প্রতিভায় তোমাদের পাঠানো লেখা শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের মিষ্টি মিষ্টি, দুষ্টু দুষ্টু লেখাগুলো দ্রুত পাঠিয়ে দাও। আগামী সংখ্যা হতে তোমাদের জন্য দু'-দু'টি পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকবে। তোমাদের সাড়া পেলে ভাবছি, ২০১৯ সাল থেকে লেখা প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দেবো। থাকবে পুরস্কারেরও ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে তোমাদের মন্তব্য জানিয়ো। –বিভাগীয় সম্পাদক